বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে

আসকার ইবনে শাইখ

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে

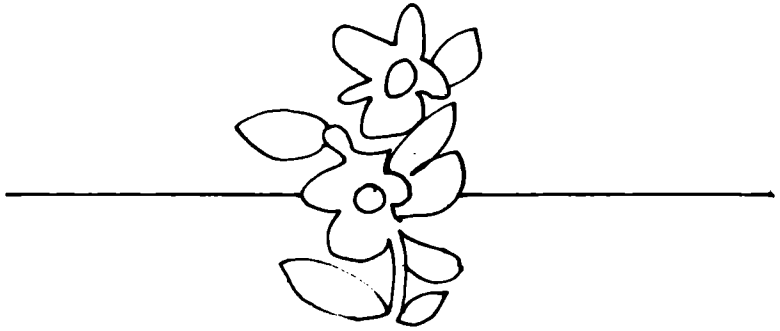

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে

আসকার ইবনে শাইখ

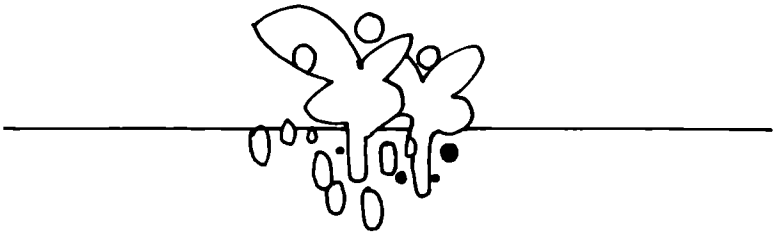

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে
আসকার ইবনে শাইখ
প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
বাসাপ্র ২৯
প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৯৮
অক্টোবর১৯৯১
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোমিন উদ্দীন খালেদ
মুদ্রক
ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা
কম্পোজ
কনফিডেন্স কম্পিউটিং এন্ড প্রিন্টিং, ঢাকা
মূল্য
পঞ্চাশ টাকা

Bangla Shahitter Kromobikash Proshange
Askar Ibne Shaikh
Published by
Abdul Mannan Talib
Director
Bangla Shahitta Parishad
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217
Published on
October 1991
Price
Tk. 50.00

www.pathagar.com

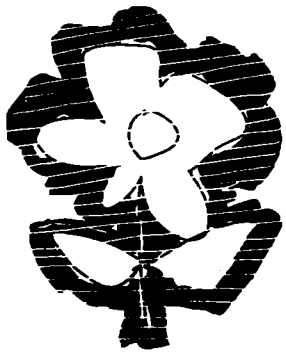

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থ

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস–নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান
২. দরোজার পর দরোজা–আবদুল মান্নান সৈয়দ
৩. বাংলা সাহিত্যের ধারা–মুহম্মদ মতিউর রহমান
৪. সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঃ ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট–আবদুল মান্নান তালিব
৫. ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান– আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

জনাব আসকার ইবনে শাইখ রচিত এবং 'দৈনিক ইনকিলাব' ও 'সাপ্তাহিক অগ্রপথিক'-এ প্রকাশিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের রূপরেখা সম্বলিত এবং পরবর্তীতে বাংলা ভাষা-আন্দোলন সংক্রান্ত কতিপয় প্রবন্ধের সঙ্কলন হচ্ছে এই 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে' ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থটি। ১৯৫১ সাল থেকে কয়েক বছরের জন্য জনাব শাইখ ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের 'সাহিত্য ও লোককলা বিভাগের' সম্পাদক। সে সময়ে তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক বায়ান্ন-তেপ্পান্ন-চুয়ান্নতে প্রকাশিত মাসিক সাহিত্যপত্র 'দ্যুতি'র সম্পাদনার দায়িত্বেও তিনি নিয়োজিত ছিলেন। সেই 'দ্যুতি'তে প্রকাশিত বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের রচনা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির উপর রচিত একটা পরিসংখ্যানী খতিয়ানও এ সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি, এ সঙ্কলনটি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অতীতের বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামত তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

-আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

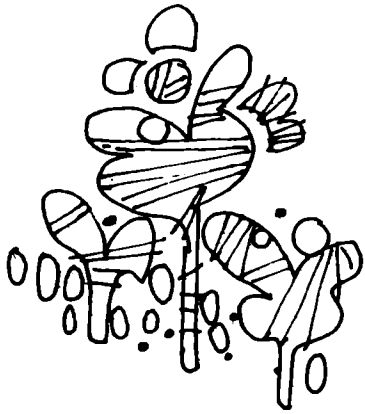

সূচী পত্র

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষকালের রূপরেখা ৯
২. স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারা ১৭
৩. মুঘল আমলে বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ২৪
৪. ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ৩২
৫. বাংলা সাহিত্যের ধারাঃ একুশে ফেব্রুয়ারী ৪০
৬. আমাদের সাহিত্যচর্চায় মহান একুশের তাৎপর্য ৪৭
৭. 'বায়ান্ন-তেপ্পান্ন-চুয়ান্ন'র দ্যুতি ৫৭

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের
উন্মেষকালের রূপরেখা

স্মর-গরল-খন্ডনং শিরসি মন্ডনম্
দেহি পদ-পল্লব মুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো-
হরতূতদুপাহিত-বিকারম।।

হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক তোমার ওই মনোহর পদপল্লব আমার মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জ্বলছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দুরীভূত হোউক।

মহারাজা লক্ষণসেনের অন্যতম রাজকবি জয়দেব রচিত শ্রী গীত গোবিন্দ থেকে উদ্ধৃতাংশ-সেই বিখ্যাত কবিতাংশ যার মধ্যেকার এক চরণ 'দেহি পদপল্লব মুদারম্'। ভোগবিলাসপূর্ণ সেন-রাজসভার মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক মানস প্রকাশ। দেশের একদিকের চিত্র।

অন্যদিকে দেশের আপামর জনসাধারণের কবিরা তাঁদের রচিত চর্যাপদে প্রকাশ করছেন জনগণেরই দুঃখভরা আর্তি ও অভাব-দারিদ্রভরা ঘর-সংসারের দৃশ্যঃ

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামাঅ।। (চর্যাঃ৩৩)

টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়ীতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি)। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে (অর্থাৎ যে খাদ্য প্রস্তুত, তাও নিমেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে)।

অভাব-ক্ষুধা-বেদনার আক্ষেপ-পীড়িত জীবনের বাস্তব করুণ এক চিত্র এতে পরিস্ফুট। অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারত বিদ্যা' বিভাগের অধ্যাপক শ্রী অতীন্দ্র মজুমদার তাঁর রচিত 'চর্যাপদ' গ্রন্থে বলেন, "একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্যবিলাস এবং কামবাসনার সোৎসাহ আতিশয্য, কাব্য-কবিতাগুলোর অধিকাংশই যৌন-কামনাবাসনায় মদির ও মধুর; রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া চূড়ান্ত লাম্পট্য, চারিত্রিক অবনতি, তরল রুচি ও দেহগত বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির

www.pathagar.com

কলঙ্কে মলিন,.....অন্যদিকে নিদারুন দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অভাব, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু।.....সমস্ত বাংলা দেশই যেন এই অন্ধকারের সুকঠোর পেষনে মৃত্যুযন্ত্রনায় অভাব-দৈন্য পীড়িত পার্বতীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করছে-"গই ভবিত্তি কিল কা হমারী!" গই ভবিত্তি কিল কা হমারী! কি গতি হবে আমার! এমনি এক রাষ্ট্রীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তের শতকের প্রারম্ভে শুরু হয়েছিল বংলায় মুসলিম বিজয়।

মুসলিম বিজয়ের আগে এদেশে বংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপটা কেমন ছিল-এ সম্পর্কে এখানে তুলে ধরছি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যঃ "জানি না কত দিন বঙ্গবাণী জন্মিয়া ঘরের কোণে লাজুক বধূটির মত নিরিবিলি বাস করিয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালার অতি স্মরণীয় সুপ্রভাত যেদিন সে সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আসরে দেখা দিল। বাস্তবিক সেদিন বাঙ্গালীর এক নবযুগের পুণ্যাহ। সেদিন তাহার আকৃতি শুধুই কবিতাময়ী, তাহার প্রতি চরণক্ষেপে বিচিত্র ছন্দের লীলাভঙ্গী, তাহার কণ্ঠে নানা মন-মাতান রাগরাগিনী। প্রথমে উচ্চবর্ণেরা বলিয়া উঠিলেন, 'ভ্রষ্টা, অস্পৃশ্যা'। কিন্তু আবার এমন দিন আসিল, যেদিন ব্রাহ্মণ তাঁহার সংস্কৃত আভিজাত্য ভুলিয়া বঙ্গবাণীর লালিত্যভরা রাঙা পায়ে বিকাইতে চাহিলেন।

যাঁহারা বলিয়াছিলেন-'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ', নিশ্চয় তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে আবাহন করিয়া আনেন নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপক্ষেরাই সনাতন পন্থিগণকে বিমোহিত করিয়া বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই এই মোহিনী বঙ্গবাণীর সাধনা করিয়াছিল। পরে স্বার্থের খাতিরে লৌকিক দেবতার পূজকেরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

ধর্মের দলাদলিতে লৌকিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি বা পুষ্টি পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে নুতন কথা নহে। এই ভারতবর্ষেই আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৌদ্ধ ধর্মে পালি সহিত্যের উৎপত্তি। ....নুতন ধর্মপ্রচারকগণ নিজেদের মত সর্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রচলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাচীন দল সাধারণের উপর নিজেদের সাবেক দখল বজায় রাখিবার জন্য চলিত ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, প্রথম খন্ড, ১৯৫৩, পৃঃ ১-২)।

বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের আগে সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁদের মত প্রচার করেন। এ সময়েই বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে সদ্ধর্মের ও পূর্বাঞ্চলে নাথ মতবাদের উৎপত্তি হয়। চুরাশিজন সহজিয়া বৌদ্ধাচার্যের মধ্যে মীননাথ, লুয়ীপা, বিরুপা, ধামপা প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন বাঙ্গালী। এঁদের মধ্যে মীননাথকেই 'বঙ্গের আদি কবি' বলে অধিকাংশ পন্ডিতের ধারণা। তাঁর একটি পদ হচ্ছে,ঃ কহন্তি পরমার্থের বাট। কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট।। কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা। কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।।

www.pathagar.com

মীননাথের অভ্যুদয়কাল সম্পর্কে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী সপ্তম শতক নির্দেশ করেছেন এবং এটাই গ্রহণীয় হয়েছে পন্ডিতদের দ্বারা। তাহলে ওই সময়কার লৌকিক ভাষার একটা নমুনা উপরোক্ত মীননাথের পদটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তখনকার লোকভাষার আরও নমুনা পাওয়া যায় ডাক ও খনার বচন থেকে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি ডাকের বচনে সে সময়কার ভাষার নমুনা দিয়েছেনঃ "বর সুণ গোহালী কিমু দুঠ্য বলদেঁ" –আজকের বাংলায় তা দাঁড়ায় "শূন্য গোয়াল ভাল, দুষ্ট গরু ভাল নয়।" ওইসব বচনে ব্যবহৃত ভাষা এবং চর্যাপদের ভাষা হচ্ছে আজকের বাংলা ভাষার পূর্বরূপ সৃজ্যমানকালের ভাষা। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "খৃস্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছিল। এই চারিশত বৎসরই বাংলা ভাষার সৃজ্যমানকাল। এই সময়কার একেবারেই গোড়ার দিকে বঙ্গদেশে 'সংস্কৃত' ছাড়া আরও দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল–তাহার একটি 'সৌরসেনী– প্রাকৃত' বা 'সৌরসেনী –অপভ্রংশ' আর একটি 'মাগধী–প্রাকৃত' বা 'মাগধী অপভ্রংশ'। এই 'মাগধী–অপভ্রংশেরই' বিবর্তিত রূপ 'বাংলা ভাষা'। ...ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চর্যাপদগুলোর ভাষা সৃজ্যমানকালের বাংলা ভাষা।" (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৯৫৭, পৃঃ ৮)।

এসব মতামত থেকে আমরা মুসলিমদের বাংলা বিজয়ারম্ভের প্রাক্কালে এদেশের লৌকিক ভাষার নমুনা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছি। অতঃপর এদেশে আরম্ভ হয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার হাতবদল– ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের পরিবর্তে মুসলিম শাসন। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "১২০৩ খ্রীস্টাব্দেই তুর্কী বীর ইখ্‌তিয়ারু–দ্–দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে লখ্‌নৌতী হইতে বিতাড়িত করিয়া, বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া, বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩)।

তুর্কী আমলে আরও একটি বিষয়ে সৃজ্যমান কাল এল; সেটা বাংলায় ইসলামী পরিবেশের সৃজ্যমান কাল। বাংলায় মুসলিম বিজয়ারম্ভের বেশকিছু আগে থেকেই যে এদেশে ইসলামের আলো এখানে–ওখানে জ্বলে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছিলেন আরব–পারসিক বণিক ও ধর্ম প্রচারক দরবেশগণ। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের পর এই প্রচারণা আরও জোরদার হয়েছিল নিঃসন্দেহে। ফলে, এদেশে গড়ে উঠছিল একটা ইসলামী পরিবেশ। ডক্টর এনামুল হক বলেন, "এই পরিবেশ শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এদেশের অমুসলমানেরাও এই আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। এই পরিবেশে রচিত রামাই পন্ডিতের 'শূন্য পুরাণের' অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।...'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক অংশটির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও স্পষ্ট যে, ইহা মুসলমান তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ–বিজয়ের পরের, অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের

www.pathagar.com

দিকের রচনা।....বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 'সদ্ধর্মী'দের উপর জাজপুর, উড়িষ্যা ও মালদহবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনার সহিত মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণের ন্যায় একটি কাল্পনিক চিত্র অংকিত হইয়াছে।....'ইসলামী পরিবেশে'র একটা অপরিগণিত রূপ ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে...।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫-১৬)।

'শূন্য পুরাণ'স্থ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' থেকে একটি উদ্ধৃতাংশ ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিককার ভাষার একটা নমুনা ও ইসলামী পরিবেশের কিছুটা ধারণার উপর আলোকপাত করবেঃ

"ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ভ হৈল্যা শুলপানি।
গণেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজী
ফকির হৈল্যা যথ মুনি।।

.....

আপনি চন্ডিকা দেবী তিহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর।
জথেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশকরিলাজাজপুর।।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল ।
ধরিআ ধর্ম্মের পায় রামাঞি পন্ডিত গারএ
ই বড় বিসম গন্ডগোল ।।"

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই ইসলামী পরিবেশ এদেশে সৃষ্ট হয়েছিল ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তিবর্গের সজ্ঞান প্রয়াসের ফলেই। মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব অগ্রগতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের লক্ষ্যে ইসলাম দিয়েছে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য জোর তাগিদ। দায়িত্বশীল জ্ঞানবান মুসলমানগণ কোরআন হাদীসের অনুজ্ঞাসমূহ মেনে চলবেন-এই-ই তো স্বাভাবিক। এদেশে মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিককালে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব প্রসার ও উন্নতি এই অনুজ্ঞা পালনেরই পুরস্কার। ডক্টর এম, এ, রহিমের কথায়, "মুসলমানরা খেলাফত যুগের খ্যাতনামা পূর্বসূরীদের নিকট থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। যেখানেই তারা গিয়েছে, সেখানেই তারা শিক্ষা ও জ্ঞানের ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে গেছে"। এই ঐতিহ্য নিয়েই মুসলমানরা এসেছিল ভারতবর্ষে, এসেছিল বাংলায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে মসজিদই ছিল মুসলমানদের যাবতীয় ক্রিয়াকান্ডের মূল কেন্দ্র; আল্লাহর এবাদত ছাড়াও মসজিদে থাকত সর্বস্তরের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। মসজিদের ইমামরা ছিলেন সমাজের সর্বস্বীকৃত বিদ্বান ব্যক্তি। এবং শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালনে

www.pathagar.com

তাঁদের সঙ্গী হতেন অন্যান্য সুশিক্ষিত আলেম-উলামাগণ। এমনি করে মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত নিম্ন থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার এক-একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য ছিল মক্তব; মসজিদেও মক্তবের ব্যবস্থা থাকত, স্থাপিত হত অন্যত্রও। সেসব মক্তবে শিক্ষা দেওয়া হত কোরআন তেলাওয়াত, প্রারম্ভিক গণিত, ব্যাকরণ, ইতিহাস।

কোন বিখ্যাত আলেম বা জ্ঞানী সাধককে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠত এক-একটি উচ্চতর জ্ঞানালয়। তফসীর, হাদীছ, ফিকাহ, সাহিত্য প্রভৃতিতে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভই থাকত সেসব জ্ঞান-কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য; অনেকটা আজকের দিনের একাডেমী বা সেমিনারির মত।

এসব শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ছিল মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। ডক্টরর মোহর আলীর কথায়, "By the fifth century of Islam madrasas came into existence as parallel institutions of higher education, the most notable example being the Nizamiya Madrasa of Baghdad, founded....in 1065" (History of the Muslims of Bengal, Vol. I. B, 1985, P. 826). এ. এল. তিবাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে ডক্টর আলী আরও বলেন, "The madrasa merely supplemented, but never supplanted, the mosque as an educational institution, Gradually the madrasa acquired in practice a status of 'sanctity' not much inferior to that of the mosque, and teachers and students moved freely from one to the other according to their inclination or needs." (ibid, P. 826). শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাসা মসজিদ-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত ছিল না, ছিল পরিপূরক মাত্র। তারপর কালক্রমে মসজিদ মাদ্রাসা এবং অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের থাকা খাওয়া ও প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হত।

ইসলামের এই শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাংলার মুসলিম শাসনকর্তা ও আমীর-ওমারা ও শেখ-উলামাগণ প্রথম থেকেই দেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে মনোযোগী হন। তার ফলে এদেশে গড়ে ওঠে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং সে সবের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেশের নানা স্তরের শাসনকর্তাগণ ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গ। সুফী-সাধকগণের খানকাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিক্ষা-কেন্দ্র। রচিত হতে থাকে আরবী ও ফারসী ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ। এখানে উল্লেখ্য যে, অমুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসন-কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে যুগপৎ একটি ইসলামী সমাজ ও তাকে ভিত্তি করে একটি ইসলামী পরিবেশ গড়ে তুলতে

www.pathagar.com

চাইবেন। ওই সময়ে এদেশের মুসলিম সমাজের অধিকাংশই ছিল বহিরাগত। আর তাই এদেশের প্রচলিত ভাষা তখনো তাঁদের মাতৃভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। এমনি একটি সমাজের প্রয়োজন মেটাতে আরবী-ফারসী ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচিত হত।

ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন যে, লখ্‌নৌতি রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইখতিয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ও তাঁর আমীরগণ রাজ্য জুড়ে মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজী (১২১২-১২২৭ সাল) লখ্‌নৌতিতে একটি মসজিদ, একটি মহাবিদ্যালয় এবং একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। উদাহরণ হিসাবে এসব বলা হল। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম বিজয়ের আরম্ভকাল থেকেই শিক্ষিত সংস্কৃতিবান একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য এবং উলামা সূফী ধর্মপ্রচারকদের সমাগমে রাজধানীকে কেন্দ্র করে ইসলামী সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আরম্ভ হয়েছিল এক বিপুল আয়োজন। কালক্রমে বাংলার মসনদে উপবেশন করেছেন বিভিন্ন শাসক, বিভিন্ন সুলতান। কিন্তু সবাই ইসলামী সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতি গড়ে তোলার এ প্রয়াসকে অব্যাহত রেখেছেন। সর্বোপরি এর পেছনে সূফী সাধকদের অবদান তো ছিলই। শেখ শরফ-উদ-দীন আবু তওয়ামা ছিলেন মসুলিম বাংলার প্রথম যুগের একজন খ্যাতনামা সূফী সাধক ও বিদ্বান ব্যক্তি। সোনারগাঁও-এ তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল ওই যুগের এক আলোকোজ্জ্বল জ্ঞান-কেন্দ্র। পাণ্ডুয়ার সেই বিখ্যাত সূফী সাধক ও সুপন্ডিত শেখ আলাউল হক তাঁর নির্বাসনের দু'টি বছর সোনারগাঁও-এ কাটান। এখানে তিনি গড়ে তোলেন একটি বিখ্যাত খানকাহ। তাঁর পৌত্র শেখ বদরুল ইসলাম এবং প্রপৌত্র শেখ জাহিদও তাঁদের নির্বাসনকাল কাটান এই সোনারগাঁও-এ। এসব জ্ঞান সাধকের উপস্থিতিতে সোনারগাঁও-এর ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার উদ্দীপনা অব্যাহত থাকে।

মুসলিম বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সাতগাঁও ছিল শিক্ষা সংস্কৃতির আর একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। সাতগাঁও-এর ত্রিবেনীতে দু'টি মাদ্রাসা স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে ১২৯৩ সালে নির্মিত হয়েছিল; অন্যটি ছিল সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ১৩১৩ সালে নির্মিত 'দারুল খয়রাত' মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে উঠেছিল ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। বীরভূম জেলার নগোর ছিল আর একটি শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে তরুণ বয়সে শিক্ষালাভ করেছিলেন সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আজম শাহ এবং তাঁরই সহপাঠী হিসাবে বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ নূর কুতুব-উল-আলম। সুলতান হোসেন শাহর আমলে ১৫০২ সালে বাঁকড়া বিষ্ণুপুরের মান্দারনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছিল ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আর একটি কেন্দ্র। এমনি করে বিখ্যাত সব জ্ঞান কেন্দ্র গড়ে ওঠে পাণ্ডুয়ায়, রাজশাহী জেলার বাথায়, রংপুর, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে। ইসলামী শিক্ষা ও

www.pathagar.com

সংস্কৃতি প্রসারের প্রভাব হিন্দু সমাজের উপরও পড়েছিল। বলা যায়, মুসলিম শাসনামলেই অব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজ বহুদিনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জন্য টোল প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আগেই চালু ছিল। উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক জ্ঞান-কেন্দ্র। সেখানে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষালাভ করেছিলেন কবি কৃত্তিবাস। এই শাসনামলেই নবদ্বীপ হয়ে ওঠে হিন্দুদের জন্য একটি বিখ্যাত সংস্কৃতির জ্ঞান-কেন্দ্র। ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ তথা আর্য শাসনামলের বিপরীতে মুসলিম শাসনামলে আরবী-ফারসী ভাষায় সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ডের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় সাহিত্য কর্ম কি করে শুধুমাত্র প্রশ্রয়ই পেল না, অধিকন্তু শাসন কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতাও পেল-এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, মুসলিম শাসনকর্তাগণ তাঁদের বিজিত রাজ্যে স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠার মানসে ব্যাপক জনসমর্থনের রাজনৈতিক দিকটা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। তাঁরা নিশ্চয়ই জানতেন, অধিকাংশ জনসাধারণ ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপারে আগেকার শাসকদের প্রতি মোটেই খুশী ছিলেন না। অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদারের কথায়, " গোটা সমাজ তখন তিনটি বৃহৎ প্রাচীরের দ্বারা বিভক্ত-সবার উপরে ব্রাহ্মণ, মাঝে অগণিত শূদ্র পর্যায়ের সাধারণ লোক আর সবার পিছে সবার নীচে সমস্ত রকম সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অস্পৃশ্য দীন ও নিরন্তর দুঃখের দাহনে দগ্ধ অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি বর্ণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দূরতিক্রম্য বাধার প্রাচীর।.....এর পরিণতি তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের মধ্যে একটা গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস। এই বিরোধ, অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং অপমানের ধূমকলঙ্কে মলিন পরিবেশ সেদিন বাঙলার সমাজজীবনকে ঘোলাটে করে তুলেছিল।" প্রাক-মুসলিম আমলে ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতির একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা এবং রাজসভার ভাষা হিসাবেও তার ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। দেশের মানুষের মুখের ভাষা ছিল অবহেলিত ও ঘৃণিত। আর সে ভাষা চর্যাপদের আর্তি বহন করে ততদিনে 'নিরঞ্জনের রুস্মা'র বর্ণনায় বাংলা ভাষার স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। এই বাংলা ভাষাকে মর্যাদাদানের মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণের হৃদয় জয় করার ভাবনাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তদুপরি, তদানীন্তন বাংলার মুসলিম সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠীর বোধগম্যতার জন্যও আরবী-ফারসীর বদলে নিত্যদিনের ভাষা বাংলায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মাদি সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছিলে। এসব বিবেচনায়ই রাজশক্তির পক্ষ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য ছিল উদার পৃষ্ঠপোষকতা।

বাংলার মুসলিম শাসনামলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) তের শতকের আরম্ভ থেকে চৌদ্দ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত তুর্কী আমল, (২) মধ্য-চৌদ্দ শতক থেকে ষোল শতকের মধ্যকাল পেরিয়ে স্বাধীন সুলতানী আমল, এবং (৩) ষোল শতকের মধ্যকালের কিছু পর থেকে ইংরেজ শাসনারম্ভের পূর্ব পর্যন্ত মুঘল আমল।

www.pathagar.com

এই তিনটি আমলের মধ্যে প্রথম আমলটি রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠায় ও রাজ্য বিস্তারেই শাসন-কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত ছিল; এবং রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষেই সচেতনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল ইসলামী সমাজ ও একটা ইসলামী পরিবেশ। তদনুসারী একটা শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছিল এদেশে। প্রথম আমলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতির সত্যিকারের বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় আমল অর্থাৎ স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনাকালের কিছু পর থেকেই। এই আমলে ইলিয়াস শাহী বংশ, বিশেষ করে 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ' এবং হোসেন শাহী বংশের শাসনকালে শিল্প-সাহিত্যের প্রতি সুলতানী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল প্রত্যক্ষ। এসব আমলে কবি সাহিত্যিকরা সসম্মানে বরিত হতে থাকেন শাহী দরবারে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তখন শাহী দরবারের এই পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্মান লাভ করে যাঁরা সাহিত্য কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মুসলিম গুণীজনদের পাশাপাশি হিন্দু গুণীজনেরাও ছিলেন। ফলে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হল তার অবদানে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমল। এই আমলে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন-কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি এবং শাহ মুহম্মদ সগীর, শেখ কবীর, জৈনুদ্দিন, সাবিরিদ খান, শেখ ফয়জুল্লাহ প্রভৃতি কবিবৃন্দ। এসব গুণীজনের অবদানে সুলতানী আমলে ইসলামের মহিমান্বিত মানবিক উদারতার সঞ্জীবনী ধারায় সিক্ত বাংলার মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

www.pathagar.com

স্বাধীন সুলতানী আমলে
বাংলা সাহিত্যের বিকাশ–ধারা

বাংলায় ১২০৩ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ' বছরেরও অধিককাল যে মুসলিম শাসনামল, তার মধ্যে তুর্কী আমল বলে চিহ্নিত শাসনকালে (১২০৩–১৩৩৮) দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতি বাংলার শাসনকর্তাদের পূর্ণ আনুগত্যকাল মাত্র ৪৪ বছরের, ১২২৭ থেকে ১২৭২ সাল পর্যন্ত। তার আগে ও পরে বাদবাকী সময়টায় কখনও বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে শাসিত হয়েছে, কখনও দিল্লীর অধীনস্থ হিসাবে শাসিত হয়েছে। স্বাধীনতা–অধীনতার এই টানাপোড়েনে অবস্থা চরম পরিণতির পর্যায়ে পৌঁছেছে ১২৭২ থেকে ১৩৩৮ সালের মধ্যবর্তীকালে; তাই এ কালটাকে স্বাধীনতা প্রয়াসকাল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অতঃপর ১৩৩৮ সালে বাংলার তিনটি অঞ্চলে সোনরগাঁও, সাতগাঁও ও লাখনৌতিকে তিনটি রাজধানী করে আলাদাভাবে যে স্বাধীনতা ঘোষিত হল এবং ১৩৫২ সালে তিনটি অঞ্চলের সমন্বয়ে সুলতান শামস–উদ–দীন ইলিয়াস শাহ্ যে একীভূত স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠা করলেন তার স্বাধীনতা অটুট থেকেছে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত। ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় দিল্লী–ভিত্তিক আফগান শাসন এবং তার পরেই ১৫৭৫ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত দিল্লী–কেন্দ্রিক মুঘল শাসন। বাংলা তখন মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী সুবাহ মাত্র।

দু' শ' বছরের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকালে বাংলা শাসন করেছেন বিভিন্ন বংশীয় সুলতানগণ যার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হচ্ছে ইলিয়াস শাহী বংশ ও হোসেন শাহী বংশ। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকাল দু'ভাগে বিভক্তঃ প্রথম ভাগ ১৩৫২ থেকে ১৪১২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৪৩৫/৩৬ থেকে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যেকার ২৪ বছর রাজা গণেশ কর্তৃক ইলিয়াস শাহী বাংলাকে ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার প্রয়াসের ৭ বছরের বিশৃংখলা এবং সে প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর গণেশ–পুত্র যদুর ইসলামে দীক্ষিত হয়ে জালাল–উদ–দীন মুহম্মদ শাহ্ উপাধি নিয়ে সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে বিশৃংখলার অবসান। সুলতান জালাল–উদ–দীন মুহম্মদ শাহ্‌র রাজত্বকাল ১৪১৮ থেকে ১৪৩৩ সাল। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান শামস–উদ–দীন আহমদ শাহ ১৪৩৫/৩৬ সালে নিহত হলে বাংলার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ইলিয়াস শাহী বংশ ইতিহাসে যা 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ' বলে অভিহিত।

ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম ভাগের সুলতানগণ হচ্ছেনঃ শামস–উদ–দীন ইলিয়াস

www.pathagar.com

শাহ্ (১৩৫২-১৩৫৭), সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৯৩), গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১০/১১) ও সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ (১৪১০/১১-১৪১১/১২)।

মধ্যবর্তী গনেশ বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেনঃ জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ (যদু) (১৪১৮-১৪৩৩) ও শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্ (১৪৩৩-১৪৩৫/৩৬)।

'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেনঃ নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৫/৩৬-১৪৫৯/৬০), রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪), শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮১) ও জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ্ (১৪৮১-১৪৮৭)।

হোসেন শাহী বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেনঃ আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯), নাসির-উদ-দীন নুসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩১), আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩১-১৫৩৩) ও গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮)। উপরোক্ত সুলতানগণের অনেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এবং নিজেদের বিদ্যা ও কাব্যানুরাগের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "ইলিয়াস শাহ একজন দূরদর্শী সুলতান ছিলেন; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশে মুসলিম সাংস্কৃতিক জাগরণের এক নবযুগ সূচনা করিল। (তখন থেকে) গৌড়ীয় শাহী দরবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ু-কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে ও চারুকলার পরিপোষক আবহাওয়া সৃষ্টিতে একটির পর একটি করিয়া মুসলিম সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা যোগাইতে থাকে।" (দ্রষ্টব্য-ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হকঃ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৯৫৭ সাল পৃঃ ৩১)।

বস্তুত, ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, তার পরিণামে ক্রমসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এই ঐতিহ্য নবতর প্রাণ-প্রাচুর্যে আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌র কালে, পরবর্তী ইলিয়াস শাহ বংশীয়দের রাজত্ব কালে ও হোসেন শাহী আমলে। 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' সুলতানদের অবদান প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য হচ্ছেঃ "এই সময়ে গৌড়ের শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নীরব অভিযানের আর এক ধাপ সুদৃঢ় করিয়া রচিত হইল। ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গৌড় দরবারে প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এইবার এই স্বীকৃতির ভিত্তি আরও ব্যাপক ও সুদৃঢ় হইল।" (দ্রষ্টব্য-প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪-৩৫)।

হোসেন শাহী সুলতানদের অবদান প্রসঙ্গে ডক্টর হক বলেনঃ "১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ বাদশাহ হইলেন। বাংলা ইতিহাসে হুসেনী বংশের ৪৫ বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫৩৮) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্য,

www.pathagar.com

অধিকন্তু সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চিরবিখ্যাত। এই বংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। বাংলায় 'ব্রজবুলি ভাষায়' পদ রচনা করিবার রেওয়াজও হুসেন শাহের সময় প্রবর্তিত হইল। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের, বিশেষ করিয়া ধর্ম সাহিত্যের বাংলা ভাষায় অনুবাদ হুসেন শাহের আর এক বড় কীর্তি। বাংলার সর্বপ্রথম 'বিদ্যাসুন্দর কাহিনী'ও হুসেন শাহের আমলে রচিত হয়। এইভাবে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলার লৌকিক কাহিনী 'মনসা-মঙ্গল' বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান শাখা 'ব্রজবুলি পদ' হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের অনুবাদ 'বাংলা মহাভারত' এবং ভারত বিখ্যাত পৌরাণিক গল্প 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আর্বিভাব ও তৎকর্তৃক 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের' প্রতিষ্ঠা। চৈতন্যদেব তাঁহার মাতৃভাষা বাংলায় 'গৌড়ীর বৈষ্ণব মত' প্রচার করায় বাংলা সাহিত্যের এক নুতন দিক খুলিয়া গেলঃ বাংলায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি প্রোথিত হইল।" (দ্রষ্টব্য-প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫-৩৭)।

এবার স্বাধীন সুলতানী আমলের একটা কবি ও কাব্য পরিচিতি এখানে তুলে ধরতে চাই। এ প্রসঙ্গে কবিদের আবির্ভাবকাল ও কাব্য রচনাকাল নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর দেখা যায় বলে আমরা সঠিক কাল নির্ণয়ের মধ্যে না গিয়ে "এ পর্যন্ত গ্রহণীয় সম্ভাব্যকাল" উল্লেখ করেই তালিকাটি তৈরী করেছি। প্রথমেই বলে নেয়া উচিত যে এ তালিকা সম্পূর্ণাঙ্গ নয়, সম্পূর্ণাঙ্গ হতেও পারে না; কারণ, ঐতিহাসিক ও পন্ডিতবর্গের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে, তারই একটা খতিয়ান দেওয়াই আমাদের পক্ষে সম্ভব। অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ বরাবরই চলবে, নতুন তথ্যও তাই প্রকাশিত হতে পারে নতুন করে। মুসলিম কবিদের তালিকাটি বিশেষ করেই অসম্পূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "বাংলার মুসলমানদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, রাজ্যহারা হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা প্রতিবেশী হিন্দুর সহিত ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিলেন না। ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া, এ দেশের হিন্দুদের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ও তাহার ফলস্বরূপ জাতীয় বিলুপ্ত-ঐতিহ্য সন্ধান ও উদ্ধারের স্পৃহা জাগিল, তাহাতে রাশি রাশি বাংলা পুঁথি ও পান্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়া গেল। তাহার সহিত দুই চারিটি মুসলিম পুঁথিও যে উদ্ধার হইল না, তাহা নহে, সংগ্রহের প্রেরণায় মুসলমানের বাড়ি হইতে মুসলিম পুঁথি সংগৃহীত হইল না। ইহার জন্যই বাংলার মুসলমানদের এক বিরাট জাতীয় সম্পদ ধ্বংস হইয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের আবির্ভাব (১৮৬৯-১৯৫৩) না ঘটিলে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম। তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টায় শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে বাংলার মুসলমানদের যে সমস্ত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল, বর্তমান

www.pathagar.com

আলোচনায় তাহাই আমাদের প্রধান সম্বল। এতদসত্ত্বেও প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের দান সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না।" (দ্রষ্টব্য-প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫)।

তালিকা—এক

কবিদের নাম	বাংলায় কাব্য-কৃতি	সম্ভাব্য কাল ও মন্তব্য
কৃত্তিবাস	রামায়ণ	'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' বংশীয় দ্বিতীয় সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪); এর আগেকার মতামত খন্ডন করেছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়
মালাধর বসু (গুণরাজ খান)	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়	-ঐ-
বিজয়গুপ্ত	মনসা মঙ্গল	অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্ (১৪৮১-৮৭)
বিপ্রদাস পিপিলাই	মনসা বিজয়	সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)
যশোরাজ খান	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়	-ঐ-
কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত (অংশ)	-ঐ-
শ্রীকর নন্দী	মহাভারত (অংশ)	-ঐ-
শ্রীধর	বিদ্যাসুন্দর	সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২-৩৩)
বৃন্দাবন দাস	চৈতন্য ভাগবত	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮)
জয়ানন্দ	চৈতন্য মঙ্গল	আফগান শাসনামল (১৫৩৯-৭৫)
মুক্তারাম সেন	সারদা মঙ্গল	-ঐ-
রামচন্দ্র খান	মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব)	-ঐ-
রঘুনাথ পন্ডিত	কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী	-ঐ-
মাধবাচার্য	শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল	-ঐ-
দ্বিজ বংশীদাস	মনসা মঙ্গল	-ঐ-
চন্দ্রাবতী	মনসা মঙ্গল	-ঐ- (সম্ভবত)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্য মঙ্গল	-ঐ- (সম্ভবত)

এ ছাড়াও রয়েছেন, 'গৌরীমঙ্গল' রচয়িতা শঙ্করকিরণ মিশ্র, 'চৈতন্য চরাণামৃত' রচয়িতা কবি কর্ণপুর, 'বিদ্যাসুন্দর', রচয়িতা কবি কঙ্ক, 'রামায়ণ' রচয়িতা দ্বিজ অনন্ত, কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা ও 'গুণরাজ' উপাধিপ্রাপ্ত কবি ষষ্ঠীধর, 'চৈতন্য মঙ্গল'-এর কবি লোচন দাস, 'চন্ডী মঙ্গল' রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং আরও আরও কবি।

www.pathagar.com

এর থেকে ধারণা করা যায় যে, হিন্দু কবিগণ ওই যুগে ধর্মীয় ও দেব-দেবী সম্বলিত কাহিনী নিয়েই কাব্য রচনা করেছেন। কবি শ্রীধর ও কবি কঙ্ক রচিত 'বিদ্যাসুন্দর'ই এর একমাত্র ব্যতিক্রম। শ্রী চৈতন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও বৈষ্ণব-মতের প্রতিষ্ঠাতা বলে তাঁর ভক্তদের কাছে তিনিও 'দেবতা'ই বটেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "তখনও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হয় নাই। সাহিত্য যে ধর্মপ্রধান না হইয়া রসপ্রধান হইতে পারে এই কথা তখনও বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকগণ কল্পনাই করিতে পারেন নাই।" (দ্রষ্টব্য-প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭)।

তালিকা-দুই

কবিদের নাম	বাংলায় কাব্য-কৃতি	সম্ভাব্য কাল ও মন্তব্য
মুজাম্মিল	সায়াৎনামা, খঞ্জন সুলতান চরিত্র, নীতিশাস্ত্র-বার্তা	রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪)
চাঁদ কাজী	পদাবলী	সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)
শেখ কবীর	পদাবলী	সুলতান আল-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২-৩৩)
আফজাল আলী	নসীহৎনামা	-ঐ-
শাহ্ মুহম্মদ সগীর	য়ুসুফ-জলিখা	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮)
জৈনুদ্দীন	রসূল বিজয়	আফগান শাসনামল (১৫৩৯-১৫৭৫)
সাবিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দর, রসূল বিজয়, হানিফা ও কয়রাপরী	অনির্ণীত
দোনা গাজী	সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল	অনির্ণীত
শেখ ফয়জুল্লাহ্	গোরক্ষ বিজয়, গাজী বিজয়, সত্যপরী, জয়নবের চৌতিশা	আফগান শাসনামল (১৫৩৯-৭৫)। -ঐ-

সারা বাংলায় অনুসন্ধান চালালে আরও যে অনেক কবি ও তাঁদের কাব্য-কৃতির সন্ধান পাওয়া যেত তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তবু যতটুকু জানা গেছে তা থেকেই উপরোক্ত তালিকা তৈরী করা হয়েছে। আর তা থেকে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম কবিরা ওই সুলতানী আমলে বিষয়-বৈচিত্র এনে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করেছেন। কাব্যসমূহের শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যায়, তাঁরা প্রেমমূলক মুসলিম কাহিনী কাব্য ও ভারতীয় কাহিনী কাব্য, মুসলিম ধর্মীয় কাব্য, হিন্দু ধর্মীয় কাব্য, বীরগাথা ও রম্যকাব্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর কাব্য রচনা করেছেন। বলতে হয়, মুসলিম কবিরাই প্রথমে ধর্মপ্রধান সাহিত্যগন্ডির বাইরে এসে রসপ্রধান কাব্য চর্চায় ব্রতী হয়েছেন। রচিত হয়েছে 'ইউসুফ-জোলোয়খা' 'সয়ফুল মুলক-

www.pathagar.com

বদিউজ্জামাল' ও 'হানিফা ও কয়রাপরী' কাব্য।

মুসলিম কবিদের রচিত ধর্মীয় কাব্যগুলোর মধ্যে দু'টি শ্রেণী দেখা যায়ঃ (১) ইসলামী শরা-শরীয়ত সম্বলিত কাব্য এবং (২) হিন্দু কবিদের রচিত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক 'বিজয়-কাব্যে'র অনুরূপ মুসলিম মহাপুরুষদের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক 'বিজয়-কাব্য'। এসব 'বিজয়-কাব্য'কে ঐতিহাসিক কাহিনী কাব্যও বলা যায়। 'গাজী বিজয়' সুপ্রসিদ্ধ সূফী ইসমাইলকে নিয়ে রচিত, 'গোরক্ষ বিজয়' রচিত নাথ-গুরু গোরক্ষনাথকে নিয়ে; আর 'রসূল বিজয়' ঐতিহাসিক এ তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অবিশ্যি ইতিহাস এসব কাব্যে বহুল উপকথা কল্পকথা মিশ্রিত। বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে সত্যপীর কাহিনী কাব্য। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই সত্যপীরকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তেমনি 'পদাবলী' রচনাতেও শামিল হয়েছেন মুসলিম কবিরা। সত্যপীর ও পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এ দু'টি ধারা হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়-সঞ্জাত সৃষ্টি।

স্বাধীন সুলতানী আমলে মুসলিম কবিরা তাঁদের কাব্যচর্চায় যে বৈচিত্র্য এনেছেন তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, 'জয়নবের চৌতিশা' জাতীয় মানবিক শোক-গাঁথামূলক রচনায় এবং 'সায়াৎনামা' ও 'নীতিশাস্ত্র-বার্তা' জাতীয় নীতিকথামূলক কাব্য প্রয়াসে। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারেঃ মুসলিম কবিরা কি তাঁদের কাব্যচর্চায় হিন্দু কবিদের অনুকরণ করেছেন? উত্তরে বলা যাবেঃ না, অনুকরণ নয়; মুসলিম কবিরা তাঁদের ধর্মীয় রচনায় হিন্দু কবিদের অনুসরণ করেছেন। তদুপরি মুক্ত চিন্তা নিয়ে তাঁরা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের পথ-নির্দেশ করেছেন; বিভিন্ন দিগন্তে পাড়ি জমিয়েছে তাঁদের কবি-কল্পনা। হিন্দু কবিদের অন্বেষন যেখানে ধর্মীয় কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের উৎসেই প্রধানত সীমিত ছিল,বাংলার মুসলিম কবিদের অন্বেষা তখন ধমীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে ভারতীয় সাহিত্য ছাড়াও আরবী -ফারসী সাহিত্যের বিশালতায় আহরিত মুসলিম মনীষার সমৃদ্ধ সঞ্চয়কে আত্মস্থ করতে নিয়োজিত। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়ঃ ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলিম কবিরা হিন্দু কবিদের অনুসরণই বা করেছেন কেন?

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অবদান ছিল ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের নিরঙ্কুশ একাধিপত্যের অবসান ও অব্রাহ্মণ হিন্দু মেধার মুক্তিদান। এই মুক্তি কার্যকরী হয়েছিল একটা নীতি ভিত্তিক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজশক্তি যখন অনুপস্থিত, অব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় গুপ্তধনে হাত দেওয়ার জন্য 'ধর্মচ্যুতি' বা রৌরব নরকের ভয়ও আর তখন নেই। এবং যোগ্যতার মাপকাঠিতে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণেও নেই কোন বাধা। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে ব্রাহ্মণ্যবাদী জগদ্দল বাধার নিগড় থেকে মুক্তি পেল বলেই আর সকল হিন্দু পিতৃ-পিতামহের প্রচলিত ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। বরং সুদীর্ঘকালের এক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তারা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল যে বিদ্যমান শাসনামলে গোটা

www.pathagar.com

হিন্দু সমাজই তখন এক রকম অবক্ষয়ের মুখোমুখি। এও তাদের অনুধাবন করার কথা যে, গত আড়াই শ' বছরের মধ্যে বাংলায় মুসলিম শক্তি শুধুমাত্র দৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেই শক্তির প্রাধান্যকে ধারণ করার মতো উপযুক্ত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশসহ একটা সংহত মুসলিম সমাজও ততদিনে গড়ে উঠেছে। বাস্তবতার এমনি অনুধাবনই হিন্দু চিন্তায় বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চাকে প্রয়োজনীয় করে তোলে দু'টি সম্ভাব্য কারণেঃ (১) সংস্কৃত সাহিত্যের গুপ্তধন আহরণ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান-ভান্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তোলা এবং (২) ইসলামী সমাজ বিধানের সাম্য ও উদারতার আকর্ষণ থেকে হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করা। এই উভয়বিধ অথবা যে কোন কারণের জন্যই হোক, হিন্দুদের ধর্মীয় কথা বাংলা ভাষায় কাব্য সুষমা দিয়ে প্রচার ও প্রকাশের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

হিন্দু কবিদের এই কাব্যচর্চা আরম্ভের কালে বাংলায় মুসলিম সমাজের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ারও প্রয়োজন আছে। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রায় আড়াই শ' বছর তখন অতিক্রান্ত। এর মধ্যে বাংলায় বহিরাগত মুসলিমদের সন্তান-সন্ততিরা ততদিনে বাঙ্গালীই হয়ে গেছে; বাংলা ভাষা পরিণত হয়েছে তাদের মাতৃভাষায়। তাদের নিয়ে এবং এদেশীয় বাংলা ভাষাভাষী ধর্মান্তরিত ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে গঠিত তখন বাংলার মুসলিম সমাজ। এ সমাজের পড়শী বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু সমাজ। দেশের এমনি সামাজিক বাস্তবতায় হিন্দু কবিদের বাংলা ভাষায় রচিত কাব্য-কথা হিন্দু জনসাধারণের মনে তো বটেই, মুসলিম জনসাধারণের মনেও যথেষ্ট সাড়া জাগানোর কথা। আর ধর্মান্তরিত মুসলিম পরিবারে সেই সাড়া যে প্রবলতর হতে পারে, তার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। তদুপরি, হিন্দু কবিদের রচিত কাব্য-কথার সুষমায় যে মুসলিম মানসে ধর্মীয় বিভ্রান্তি আনতে পারে, তার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই মুসলিম কবিরা হিন্দু কবিদের অনুসরণে নিজেদের ধর্মীয় কাব্যচর্চায় হাত দিলেন। এবং হাত দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই অনুসরণকারীর স্থলে হয়ে দাঁড়ালেন অনুসরণযোগ্য, অনুসরণীয়। শুধু ধর্মীয় কাব্য-কথা নয়, প্রেমমূলক কাহিনী-কাব্য এবং আরো নানা ধারায় কাব্য-কথার সমন্বয়ে গড়ে তুলতে লাগলেন মনোহারী এক সাহিত্য-সম্ভার। এ যেন হিন্দু কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একই মাধ্যম ব্যবহার করে কাব্য সুষমার বিচিত্র পথে তাঁদের অভিযাত্রা! এবং বিষয় বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে তাঁরা ছাড়িয়েও গেলেন হিন্দু কবিদের কাব্য-কৃতিকে। বাস্তবতার নিরিখে সমাজের প্রয়োজনকে এমনি করেই মেটাতে হয়।

www.pathagar.com

মুঘল আমলে
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

দু' শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বাধীন বাংলার সুলতানী আমলে এ দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটা সুস্থির রূপ লাভ করে। কিন্তু এই আমলের অবসানে ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছরের জন্য দিল্লী-নিয়ন্ত্রিত আফগান শাসন এবং পরে ১৫৭৫ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাকালে শাসন-ক্ষমতার হাতবদলজনিত কারণে যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তাতে এ দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সুস্থিতিও বিঘ্নিত হয়ে ওঠে। কোন দেশের শিক্ষা-সাহিত্য তথা সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তার রাজধানীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। ১৫৩৮ সালের পর বাংলা দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে যাওয়ার পর তার রাজধানীর মর্যাদা প্রাদেশিক পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে; তদুপরি, রাজ-ক্ষমতার হাতবদলজনিত কারণে বাংলার রাজধানীও স্থানান্তরিত হতে থাকে।

স্বাধীন সুলতানী আমলে গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী এবং সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্র। আফগান শাসনামলে সুলায়মান কররানীর রাজত্বকালে (১৫৬৫-৭২) গৌড় থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তান্ডা বা তাঁড়া-য়; স্থানটি গৌড় থেকে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ১৫৭৫ সালে আফগান শাসনের অবসান ঘটে; আরম্ভ হয় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল। ওই সালেই এক ভয়াবহ মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায় পরিত্যক্ত রাজধানী গৌড় নগরী। তার ১২ লক্ষ অধিবাসীর অনেকেই মারা যায়, আর বাঁচার তাগিদে ও রাজশক্তির পরিবর্তনজনিত কারণে বেশ কিছুসংখ্যক গৌড়বাসী ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে, আরাকানে, ত্রিপুরায়। ১৫৯৫ সালে তাঁড়া থেকে আবার বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় রাজমহলে। সেখান থেকে ১৬১২ সালে আবার তা স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। তখন মুঘল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এবং বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁ। রাজ্যহারা আফগানরা তখন বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে মুঘল-আধিপত্যকে ঘায়েল করার কাজে লিপ্ত; তাদের সাহায্যকারী তখন আরাকানী মঘ ও 'হার্মাদ' বলে অভিহিত পর্তুগীজ জলদস্যুরা। এমনি অবস্থা অবসানের লক্ষ্যেই সুবাদার ইসলাম খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে অচিরেই বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মুঘল-শাসন; আবার সুস্থিত হতে থাকে বাংলার

www.pathagar.com

সামাজিক অবস্থা, গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ডের জন্য উপযোগী পরিবেশ। অতঃপর সুদীর্ঘ ৯২ বছর পর ১৭০৪ সালে বাংলার রাজধানী আবার স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে মুর্শিদাবাদে; ইংরেজ আমলে সেখান থেকে তা স্থানান্তরিত হয়ে আসে কলকাতায়।

এখানে সুলতান ও সম্রাট বা বাদশা'র মধ্যেকার সামান্য পার্থক্যটা তুলে ধরা প্রয়োজন। ত্রয়োদশ শতকের কথাই ধরা যাক। বাগদাদের খলিফা তখনও 'মুসলিম দুনিয়ার' সর্বোচ্চ একক কর্তৃত্বের প্রতীক বলে স্বীকৃত। সেই কর্তৃত্ব অস্বীকার না করা পর্যন্ত সকল মুসলিম রাজ্যের প্রধান শাসক অভিহিত হতেন 'সুলতান' বলে। বিভিন্ন রাজ্যের সুলতানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে না হলেও রেওয়াজ অনুসারে বাগদাদের খলিফার আনুগত্য প্রকাশ করতেন।

সেই হিসাবে তখন দিল্লী ও বাংলার সুলতানগণও ছিলেন বাগদাদ-কেন্দ্রিক 'খেলাফতে'র নামেমাত্র অনুগত মিত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, অনান্য অনেক রাজ্যের মত বাংলার সুলতানগণও খেলাফতের প্রশাসনিক কাঠামো এবং রীতিনীতি বজায় রাখতেন। অতঃপর ভারতে এবং বাংলায়ও প্রতিষ্ঠিত হল মুঘল শাসন। মুঘল শাসকেরা ওইসব খেলাফতী কেতা-কায়দা ঝেড়ে ফেলে সম্রাট বা বাদশাহ্ খেতাবে নিজেদেরকে বিভূষিত করলেন। তখন বাংলার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেও সংযোজিত হল মুঘল সংস্কৃতি-সভ্যতার নতুন মাত্রা। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও মুঘল-প্রভাব পরিলক্ষিত হল। তখনকার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যেসব বৈশিষ্ট্য সম্পষ্ট হয়ে উঠল তা হচ্ছে; (১) রাজানুগ্রহ ছাড়াই বাংলা সাহিত্য তার অভ্যন্তরীণ শক্তিতেই এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা; (২) শিয়া-মতবাদের বিস্তৃতি; (৩) ধর্মীয় উদারতার প্রভাবে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়-প্রয়াস; (৪) সাংস্কৃতিক সমন্বয়-প্রয়াস সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলিম কবিদের কাব্যচর্চায় নিজেদের ধর্মভিত্তিক পরিচয়-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ; এবং (৫) বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে ইউরোপীয় পর্তুগীজ-সংস্কৃতির নানা উপাদানের সংমিশ্রণ।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, মুঘল শাসন ছিল বাংলার জন্য এক সাম্রাজ্যিক আধিপত্যমূলক শাসন; তখন বাংলার স্বাধীনতা ও তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। সুলতানী আমলে বাংলার শাসনকর্তারা বাংলাকেই তাঁদের নিজভূমি বলে গণ্য করতেন। জন্মগতভাবে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন এ দেশের মানুষ; তাঁদের জীবনের দিনরাত্রিগুলো কাটত এখানেই এবং মৃত্যুর পর তাঁরা কবরস্থ হতেন এই বাংলার মাটিতেই। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে তাঁরা ছিলেন বাঙ্গালী; এবং সেই পরিচয়ের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয়ের সংযুক্তিতে তাঁদের প্রয়োজনীয় একাত্মতা ছিল বাগদাদ-ভিত্তিক খেলাফত তথা মুসলিম উম্মার সঙ্গে; যার ফলে, তাঁদের দ্বিতীয় জাতি-সত্তা সুপ্রা-ন্যাশন্যাল বা রাষ্ট্রীয় সীমানাতিক্রান্ত জাতীয়তার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

www.pathagar.com

পরিচয়ের এই দ্বিত্ব সম্পর্কে সুলতানদের মত সচেতন মুসলমানরা এবং কবিরাও অবহিত ছিলেন।

মুঘল আমলে শাসনকর্তাদের সবাই বাংলায় আসতেন দিল্লী-সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে; দায়িত্ব পালন শেষে আবার চলে যেতেন তাঁদের স্থায়ী বাসভূমে। তদুপরি, মুসলিম-পরিচিতি ছাড়িয়েও তাঁদের মুঘল পরিচিতি ছিল বেশি পছন্দনীয়; আর তাই মুঘলদের রাষ্ট্রীয় সীমানাতিক্রান্ত জাতীয়তার প্রতি একাত্মতাবোধেও কিছুটা ঘাটতি ছিল। রাষ্ট্রীয় পরিচয়েও তাঁরা ছিলেন ভারতীয় মুঘল, বাঙ্গালী নয়। কাজেই বাংলার শিল্প-সাহিত্যকে তার স্বীয় বৈশিষ্ট্য অর্জনে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁদের আলাদা কোন আগ্রহ বা আসক্তি থাকার কথা ছিল না। কিন্তু ততদিনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার অগ্রগমনের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ শক্তি লাভ করে ফেলেছে, এবং তারই প্রেরণায় তা বিশেষ রাজানুগ্রহ ছাড়াই লক্ষ্যপানে এগিয়ে গেছে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ কবিদের কাব্য-কৃতির তালিকা থেকে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা।

তালিকা-তিন

কবিদের নাম	বাংলায় কাব্য-কৃতি	সম্ভাব্য রচনা-কাল
দ্বিজ মাধব	চণ্ডী-মঙ্গল গঙ্গা-মঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল	ষোল শতকের শেষ দিক
কৃষ্ণরাম দাস	রায়-মঙ্গল, কমলা-মঙ্গল চণ্ডী-মঙ্গল	-ঐ-
কাশীরাম দাস	মহাভারত	সতের শতকের মাঝামাঝি
গদাধর দাস	জগন্নাথ-মঙ্গল	-ঐ-
রূপরাম চক্রবর্তী	ধর্ম-মঙ্গল	-ঐ-
ঘনরাম চক্রবর্তী	ধর্ম-মঙ্গল	সতের শতকের শেষ দিক
ঘনরাম দাস	ধর্ম-মঙ্গল	আঠার শতকের প্রথম দিক
ক্ষেমানন্দ	মনসা-মঙ্গল	আঠার শতক
ঘনরাম চক্রবর্তী	ধর্ম-মঙ্গল	-ঐ-
রামেশ্বর	শিবায়ন কাব্য	-ঐ-
মানিকরাম গাঙ্গুলী	ধর্ম-মঙ্গল	-ঐ-
ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর	অন্নদা-মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর	-ঐ-
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ	বিদ্যাসুন্দর	-ঐ-

এই তালিকা মোটেই সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। আলোচ্য সময়ে চৈতন্যদেবের ভক্তবৃন্দ অনেকেই বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'মুসলিম বাংলা

www.pathagar.com

সাহিত্যে' বলেন, "এই সময়ে নতুন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের প্রচার ও প্রসার বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে এক নবীন সঞ্জীবনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কাজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া একরূপ বন্ধ ছিল। হঠাৎ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে শ্রী নিবাস (১৫২২-১৬০৮), নরোত্তম (১৫৩১-১৬১১) ও শ্যামানন্দের (১৫৩৫-১৬৩০) আবির্ভাবে বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ইহারা বাংলায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেভাবে বৈষ্ণব মত প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার চমকপ্রদ কাহিনী বহু বৈষ্ণব-বাংলা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; তন্মধ্যে ভক্তি-রত্নাকর, প্রেম-বিলাস, নরোত্তম-বিলাস, অনুরাগ-বল্লী প্রভৃতিই প্রধান। বাংলার জনসাধারণের উপর এই বৈষ্ণব-মহাজনদের প্রভাব অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর। .....ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, কবি শেখর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব পদকর্তারও আবির্ভাব হইল।.....বিদগ্ধ বৈষ্ণবেরা নানা পদ-সঞ্চায়ণ গ্রন্থে পদগুলিকে স্থান দিয়া ইহাদিগকে একটা স্থায়ী সাহিত্যিক মর্যাদা দান করিতে লাগিলেন।

তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিকে সংগৃহীত রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র', বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু' এবং গৌরসুন্দর দাসের 'সংকীর্তনানন্দ' গ্রন্থের নাম করা যায়।.....অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে 'রাগমালা' বা 'ধ্যানমালা' নাম দিয়া মুসলমান কবিগণ বহু পদ-সঞ্চয়ণ গ্রন্থ সংকলন করেন। এই সংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে ফাজিল নাসির মুহম্মদ কৃত 'রাগমালা' প্রাচীনতম। .....ইহাতে হিন্দু কবি ব্যতীত বহু মুসলিম কবির পদও সংগৃহীত আছে।" (পৃঃ ১৩৫-১৩৬)। এই আমলে ভারতে এবং সেই সুবাদে বাংলায় শিয়া-মতবাদের প্রভাবে বাংলার মুসলিম কাব্যচর্চায় কারবালার মর্মান্তিক কাহিনীভিত্তিক মর্সীয়া সাহিত্যের ধারা সংযোজিত হয়। এ দেশে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে জাতিগতভাবে আপামর হিন্দু জনসাধারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে ইসলামী উদারতার আবহমন্ডলে নবজীবন লাভ করলেও তারা যে একটি বিজিত জাতি-এই অনুভবটা ক্রমে ক্রমে তাদের মনে জন্ম নিয়েছিল। তদুপুরি ছিল ধর্মান্তরণের জন্য ইসলামের সাম্য ও উদারতার আকর্ষণ। এসব বিবেচনায় সমাজের ক্ষয়কে প্রতিরোধ করে তার সামনে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তোলার আগ্রহ গুণীজনদেরকে সক্রিয় করে তুলেছিল। উপরোক্ত কাব্য-কৃতির তালিকা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

এবার মুঘল আমলে মুসলিম কবিদের কাব্যচর্চার একটা রূপ-রেখা নেয়া যাক।

www.pathagar.com

তালিকা–চার

কবিদের নাম	বাংলায় কাব্য–কৃতি	সম্ভাব্য জীবন/রচনা কাল
সৈয়দ সুলতান	শব–ই–মিরাজ, নবী–বংশ, রসূল–বিজয়, ওফাৎ–ই–রসূল	১৫৫০–১৬৪৮
হাজী মুহাম্মদ	নূর–জামাল, সুরতনামা,	আনুঃ ১৫৫০–১৬২০
শেখ পরান	নূরনামা, নসীহৎনামা	আনুঃ ১৫৬০–১৬২৫
নসরুল্লাহ্ খাঁ	জঙ্গনামা, মুসার সোয়াল, শরীয়ৎতনামা	আনুঃ ১৫৬০–১৬২৫
মুহম্মদ কবীর	মধুমালতী	রচনাঃ ১৫৯৩–৯৪
সৈয়দ মর্তুজা	যোগ–কলন্দর, পদাবলী	আনুঃ ১৫৯০–১৬৬২
শেখ মোতালিব	কিফায়িতুল মুসল্লীন	আনুঃ ১৫৯৫–১৬৬০
মীর মুহম্মদ শফী	নূরনামা, নূরকন্দীল, সায়াৎনামা	আনুঃ ১৫৯৫–১৬৬৫
আবদুল হাকিম	ইউসুফ–জলিখা, লালমতী–সয়ফূলমুলক, শিহাবুদ্দীননামা, নূরনামা, নসীহৎনামা, চারি মকামভেদ, কারবালা, শহরনামা	আনুঃ ১৬২০–১৬৯০
মোহাম্মদ খান	মকতুল হোসেন	রচনাকালঃ ১৬৪৫–৪৬
নওয়াজিস খাঁ	গুল–ই–বকাওলী, গীতাবলী	আনুঃ মধ্য–সতের শতক
দৌলত উজীর	লায়লী–মজনু	রচনাঃ অধ্যাপক সুখময় মুখ্যোপাদ্যায়ের মতে ১৬৬৬
বাহরাম খান		
আবদুল নবী	আমীর হামযা	আনুঃ ১৬০০–১৭৫৭
ফকীর গরীবুল্লাহ্	ইউসুফ–জলিখা, সত্যপীর, জঙ্গনাম (১ম অংশ)	–ঐ–
মুহম্মদ ইয়াকুব	জঙ্গনামা (২য় অংশ)	–ঐ–
হায়াত মামুদ	জঙ্গনামা, হিতজ্ঞান–বাণী আত্মীয়া–বাণী	–ঐ–

www.pathagar.com

আরকান থেকে

দৌলত কাজী	সতী-ময়না ও লোর-চন্দ্রানী	আনুঃ ১৬০০-১৬৩৮ (রচনা)
মরদান	নসীবনামা	আনুঃ ১৬০০-১৬৪৫
কোরেশী মাগন	চন্দ্রাবতী	আনুঃ ১৬০০-১৬৬০
মহাকবি আলাওল	পদ্মাবতী, সতী-ময়না, হপ্তপয়কর, তোহ্‌ফা, সয়ফুলমুলক, সিকান্দারনামা	আনুঃ ১৬০৭-১৬৮০
আবদুল করিম খোন্দকার	দুল্লা মজলিস, হাজার মাসাইল	আনুঃ সতের শতকের শেষ থেকে মধ্য আঠার শতক

ত্রিপুরা থেকে

শেখ চান্দ্	রসূলবিজয়, শাহ্ দৌলা, কিয়ামতনামা	আনুঃ ১৫৬০-১৬২৫
সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	জেবুলমুলক্-শামারুখ	আনুঃ ১৬৫৭-১৭২০
শুকুর মাহমুদ	ময়নামতীর গান	আনুঃ ১৬৮০-১৭৫০
মুহম্মদ রফিউদ্দীন	জেবুল্‌মুলক্-শামারুখ	আনুঃ সতের শতকের শেষার্ধ থেকে মধ্য-আঠার শতক
শেখ সাদী	গদা-মল্লিকা	আনুঃ আঠার শতক
শেরবাজ	মল্লিকার হাজার সওয়াল, কাসেমের লড়াই, ফাতিমার সুরতনামা	অনুঃ সতের-আঠার শতক
মুহম্মদ আবদুর রাজজাক	সয়ফুলমুলক্-লালবানু	আনুঃ সতের-আঠার শতক

এ-তালিকাও সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। তবু এর কাব্য-কৃতির খতিয়ান থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুলতানী আমলে মুসলিম কবিরা যে লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলা কাব্যচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, মুঘল আমলেও সে-লক্ষ্য একই থেকেছে। রচিত কাব্যসমূহের শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যাবেঃ সর্বমোট ৬০টি কাব্যের মধ্যে মুসলিম ধর্মীয় ও নীতিজ্ঞানমূলক কাব্য হচ্ছে শতকরা ৪৭ ভাগ, মুসলিম কাহিনী-কাব্য শতকরা ২৭ ভাগ, ভারতীয় কাহিনী-কাব্য ১৩ ভাগ, মর্সীয়া-কাব্য ১০ ভাগ এবং অন্যান্য ৩ ভাগ। এ-ও লক্ষণীয় যে, মুঘল-শাসিত বাংলায় রচিত কাব্য শতকরা ৬৩ ভাগ এবং বহির্বাংলার আরাকান-ত্রিপুরায় ৩৭ ভাগ। অধিকন্তু, মুঘলশাসিত

www.pathagar.com

বাংলার অধিকতর খ্যাতিমান কবি সৈয়দ সুলতান-বাহরাম খান- মোহাম্মদ খানদের পাশাপাশি শুধু আরাকানেই রয়েছেন দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন এবং মহাকবি আলাওল। এদিক থেকে চিন্তা করলে মুঘল আমলের বাংলা সাহিত্যে আরাকানের অবদান স্মরণীয় বলে স্বীকার করতেই হবে। মর্সীয়া-সাহিত্যের প্রসার মুঘল আমলের আর একটি বৈশিষ্ট্য; এর থেকে বাংলায় শিয়া প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বোপরি, মুঘল আমলেও হিন্দু কবিদের তুলনায় মুসলিম কবিদের কাব্য-কৃতি বিষয়-বৈচিত্রে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। মুঘল আমলের বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেনঃ ".....মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের মধ্যে মুঘল আমলকে স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। মুঘল আমলে বাংলা-সাহিত্য স্বাধীনতা যুগের কিশোর অবস্থা অতিক্রম করিয়া বলদৃপ্ত যৌবনের মহিমা কীর্তন করিতেছে। ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিল? ইহার উত্তর রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় নহে, মুঘল আমলে দেশের সাংস্কৃতিক বিতর্তনেই পাওয়া যাইবে।" (পৃঃ ২৬০)।

এই আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসী সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশি। পুরো মুসলিম আমলের ক্রমবিকশিত বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করলে একদিকে যেমন তার বিকাশ ধরা পড়বে, অন্যদিকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবেঃ (১) বাংলা ভাষার ভোকেবুলারি বা শব্দ-সমগ্রে আরবী-ফারসী-তুর্কী ও ইউরোপীয় ভাষা থেকে আহরিত শব্দ-সঞ্চয়, এবং (২) তার সাহিত্যে সুসমৃদ্ধ আরবী-ফারসী সাহিত্য থেকে গৃহীত বিষয়-বৈচিত্র। এ ব্যাপারে গবেষণা হওয়া উচিত।

পদাবলী ও সত্যপীর-কাহিনী নিয়ে কাব্য-চর্চায় দুই সম্প্রদায়ের কবিদের উপস্থিতি থেকে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়-প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ সমন্বয় প্রয়াস কতটা সফল হয়েছিল, তার উত্তরের জন্য যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বরং হিন্দু ও মুসলিমদের কাব্য-কৃতিতে আমরা সমন্বয়ের চাইতে স্বাতন্ত্র্যই বেশি লক্ষ্য করি। প্রসঙ্গত বলা যায়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্ম-সমন্বয়ের প্রয়াস ব্যর্থই হয়েছিল। সম্রাট আকবরের দীন-এ-ইলাহী জনপ্রিয় হয়নি। আইন-ই-আকবরীর উল্লেখ অনুযায়ী হিন্দু রাজা বীরবল এবং আবুল ফজল, ফৈজী, শেখ মুবারক, মির্জা জানী, আজিজ কোকা প্রমুখ মিলে মোট ১৮ জন ছাড়া আর কেউই দীন-এ-এলাহী গ্রহণ করেননি। সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওই সমন্বিত ধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

আবার সাহিত্যের কথায় আসা যাক। হিন্দু ও মুসলিম বাঙ্গালী কবিরা তখন একই ভাষায়, একই কাব্য-রীতিতে, একই শব্দ-সমগ্র ব্যবহার করে সাহিত্যচর্চা করলেও দু'য়ের কাব্য প্রয়াস দু'টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। দু'য়ের উদ্দেশ্য ও স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। হিন্দু কবিরা কাব্য-প্রেরণা পেয়েছেন তাঁদের স্বীয় ধর্মীয় উৎস থেকে, আর মুসলিম কবিরা তাঁদের রাষ্ট্রীয় সীমানাতিক্রান্ত ইসলামী উৎসভিত্তিক আরবী-ফারসী

www.pathagar.com

সাহিত্য থেকে এবং সামগ্রিক মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলিম কবিদের বাংলা ভাষায় কাব্য-প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণের উপর হিন্দু কবিদের ধর্মভিত্তিক কাব্যসুষমার প্রভাবকে মোকাবিলা করে ইসলামের নীতি ও শিক্ষার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রেমকাহিনী-বীরগাঁথা-রম্যকথা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর রচিত কাব্য-মাধুরী দিয়ে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকেই তাঁরা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম কবিরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের লক্ষ্যেই কাব্যচর্চা করেছিলেন; তাঁদের কাব্যচর্চা ছিল সম্প্রদায়গত, কিন্তু আধুনিক অর্থের সাম্প্রদায়িক নয়।

www.pathagar.com

ইংরেজ আমলে
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পর থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে সুবে বাংলা চলে গেল ইংরেজ অধিকারে। আরম্ভ হল মীরজাফরী নবাবীর আড়ালে সমগ্র বাঙালী জাতির, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয়; এবং ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় সুবে বাংলার স্বাধীনতার শেষ আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল গিরিয়া-উধুয়ানালা-বকসারে নবাব মীর কাশিমের উপর্যুপরি পরাজয়ে। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর 'বাদশাহ' শাহ্ আলমের ফরমান বলে ইংরেজ কোম্পানী পেল সুবে বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা। ১৭৫৭ সালে পাওয়া দেশ রক্ষার ক্ষমতার সঙ্গে দেওয়ানী ক্ষমতার সমন্বয়ে এ দেশে ইংরেজ আধিপত্য হল নিরংকুশ। পুরোপুরিভাবে আরম্ভ হল কোম্পানী শাসন এবং শাসনের নামে শোষণ ও উৎপীড়ন। কোম্পানী সমর্থক লর্ড মেকলেও লর্ড ক্লাইভের উপর রচিত প্রবন্ধমালার ৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "ইহা সত্য যে, বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এই প্রকারের শোষণ ও উৎপীড়ন তাহারাও কোন দিন দেখে নাই।"

১৭৭০ সালে, বাংলা ১১৭৬ সনে, বাংলায় এল এক মহামন্বন্তর,'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। ১৭৭২ সালে কোম্পানীর ডিরেকটরদের কাছে লিখিত পত্রে এ দেশের তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নির্লজ্জভাবে উল্লেখ করেন, "....মন্বন্তরে বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু এবং তাহার পরিণামে চাষের চরম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের নীট রাজস্ব আদায় এমনকি ১৭৬৮ সালের রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। যে কোন লোকের পক্ষে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, এইরূপ একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজস্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ এই যে, সকল শক্তি দিয়া রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে।" কোম্পানী শোষন-উৎপীড়নের এই-ই ছিল স্বরূপ। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "বিজিত ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করবে ইংরেজঃ একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক, অর্থাৎ একটি পুরনো সমাজের ধ্বংস এবং অন্যটি বিজিত দেশে পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। সুবে বাংলা বিজয়ের পর ইংরেজ কোম্পানী এ দেশে তা-ই করেছিল। 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ' গ্রন্থে কার্ল মার্কস আরও বলেছিলেন, "কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে

www.pathagar.com

ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন.....।" (পৃঃ ৩৪)। এই নতুন শ্রেণীটিই ইংরেজ পক্ষীয় এ দেশের প্রথম দালাল শ্রেণী। এদের সাহায্যেই ইংরেজ কোম্পানী এ দেশের পুরনো সমাজকে ধ্বংস করে দিয়ে পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থের উপযোগী বৈষয়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই বৈষয়িক ভিত্তির আওতাভুক্ত ছিল সমাজ-সংসার, ধন-দৌলত শিক্ষা-সাহিত্য সবকিছু।

১৭৭২ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বাংলার শাসনে নানা পরিবর্তন আনতে থাকে। এ সময়ের গোড়ার দিকে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়, 'নবাব' হন বৃত্তিভোগী; ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত হয় জমিদারীর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এই বন্দোবস্তের ফলে বাংলার মুসলমানগণ সর্বনাশের সম্মুখীন হল। ১৮৩৬ সালে অফিস-আদালত থেকে ফারসী ভাষার ব্যবহার উঠে গেল; ফলে, বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের কিছুটা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার শেষ সম্বলও নিঃশেষ হয়ে গেল। তার প্রায় ৪০ বছর আগে থেকেই দেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার চেষ্টা চলতে থাকে। চার্লস গ্রান্ট ছিলেন তার প্রথম উদ্যোক্তা। এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজ মিশনারীদের কার্যক্রম। ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরী কলকাতায় এসে শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনে যোগ দেন। তার প্রচেষ্টায় সেখানে স্থাপিত হয় ইংরেজী স্কুল, আর বাইবেলের বাংলা গদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায়ও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়ে ওঠেন। ১৮০০ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ এবং ১৮২৩ সালে গঠিত হয় 'কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' এবং তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'সংস্কৃত কলেজ'। এভাবে দেশে আরম্ভ হল ইংরেজী শিক্ষার অগ্রযাত্রা। হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন, আর মুসলমানেরা ঘৃণাবশতঃ সে শিক্ষা থেকে সরে থাকেন অনেক দূরে।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই এক শ' বছরের কাহিনী বাংলার মুসলমানদের জন্য লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাভরা এক সুদীর্ঘ তমসাকালের রক্তঝরা কাহিনী। তারই সঙ্গে সে কাহিনী যুগপৎ এক দৃঢ়সংকল্প মরণপণ সংগ্রামেরও কাহিনী; সে কাহিনী অপূর্ব ত্যাগ ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলায় বীরত্বভরা কাহিনী। সে কাহিনী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য, দারিদ্র্য আর লাঞ্ছনার নাগপাশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুজ্জীবনের জন্য, নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ধারণ করে বেঁচে থাকার উপযোগী এক জীবন রচনার জন্য বেদনা ও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরে উজ্জ্বল এক কাহিনী। সে কাহিনীতে আছে মজনুশাহ্-তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ-দুদুমিয়াদের সংগ্রামের কথা, আছে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ প্রবর্তিত পুনর্জাগরণ আন্দোলনের 'বালাকোট'-মুখী সংগ্রামের কথা, আছে শহীদী খূনে ভাসমান অসংখ্য রক্তপদ্মের কথা। শত বছরের সেসব সংগ্রাম-কথা বুকে নিয়ে বিক্ষুব্ধ অগ্নিগিরি ১৮৫৭'র বিস্ফোরণে নিঃশেষিত হয়ে গেল; মুক্তি তখনও বহুদূরে!

www.pathagar.com

'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "বাংলার মুসলমানের এই কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও অতিশয় মর্মবিদারী। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার সাহেব তাঁহার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স্' নামক গ্রন্থে বাংলার মুসলমানদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, নিম্নে আমি তাহারই সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিযা দিতেছিঃ 'পলাশী যুদ্ধের সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহের বহুদিন পর পর্যন্ত প্রায় ১২৫ বৎসর যাবৎ বাংলার মুসলমানদের প্রতি আমাদের অবিচারের সীমা ছিল না। এই সেদিন পর্যন্ত যাঁহারা দেশের বিজেতা ও শাসক সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা আজ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেও অসমর্থ। এই সম্প্রদায় আজ সর্বপ্রকারে নিঃস্ব ও ধ্বংসোন্মুখ। ইহার জন্য দায়ী আমাদের কল্পনাবিরহিত শাসন। বাংলার অভিজাত মুসলমান ধ্বংস হইয়াছে। ....তাঁহাদের আয়ের পথ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বড়-ছোট সমস্ত রাজপদের দরজাও এখন তাঁহাদের জন্য বন্ধ ও হিন্দুর জন্য মুক্ত।' বাংলার মুসলমানদের এই অবস্থার জন্য হান্টার সাহেব একমাত্র তাঁহার স্বজাতিকেই দায়ী করিয়াছেন।" (প্রঃ ২৭১-২৭৩)। এমনি অবস্থায় বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যচর্চার কথা ভাবাই তো যায় না! তবুও তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। এই তমসাকালেও যাঁরা বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করে যাচ্ছিলেন, কাব্য-কৃতিসহ তাঁদের একটা তালিকা এখানে তুলে ধরতে চাই। উল্লেখ্য, এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রায় সব তথ্যই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' থেকে নেয়া।

তলিকা—পাঁচ

কবিদের নাম	তাঁদের জীবন/রচনা-কাল	বাংলায় কাব্য-কৃতি
মুহম্মদ রেজা	১৬৯১-১৭৬৭	তমীম-গোলাম, মিসরী জামাল
আলী রেজা	১৬৯৫-১৭৮০	সিরাজকুলুব, জ্ঞান-সাগর, আগমন, ধ্যান মালা, যোগকলন্দর, ষটচক্রভেদ
মুহম্মদ মকীম	১৭৭৩ সালে জীবিত	গুল-ই-বকাওলী, ফায়দুল মুকতাদী
মুহম্মদ আলী	১৭৭৩ সালে জীবিত	হায়রাতুল ফিকাহ্, শাহাপরী, মল্লিকজাদা, হাসনা বানু
মুহম্মদ কাসিম	১৭৩০-১৮০০?	হিতোপদেশ, সুলতান জমজমা, সিরাজুল কুলুব
সৈয়দ নূরুদ্দীন	১৭৩০-১৮০০?	দকায়িকুল হকাইক, মুসার সওয়াল, কিয়ামতনামা, হিতোপদেশ
রহিমুন্নিসা	১৭৬৩-১৮০০ (সম্ভবতঃ)	পদ্মাবতীর অনুলিখনে 'আত্মবিবরণী,' ভ্রাতৃবিলাপ, দোরদানার বিলাপ।
সৈয়দ হামজা	১৭৯০-১৮০৬ (কাব্য-জীবন)	মধুমালতী, আমীর হামজা, জৈগুনের পুঁথি, হাতিমতাঈ, সোনাভান
কবি চুহর	১৮০৪-১৮৩৫ -এর মধ্য জীবিত	আজর শাহ-সমনরুখ, মনোহর-মধু মালতী, দিলারাম
হামীদুল্লাহ খান	১৮০৮-১৮৭০	রাহ-ই-নাজাত, গুলজার-ই-শাহাদাত

www.pathagar.com

উপরোক্ত তালিকার কাব্য-কৃতি সম্পর্কে কিছু বলার আগে তার পটভূমি কিছুটা তুলে ধরা প্রয়োজন। এই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটা ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েছিল। নতুন রাজশক্তির আমলে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে, মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের সহায়ক হিসাবে গদ্যে বাইবেলাদি গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় গদ্যরীতি প্রচলন শুরু করেছে। ইংরেজ শানস প্রতিষ্ঠাকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিকে এদেশে অনুপ্রবেশের সহায়তাকল্পে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপরও রাজানুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। এমনি অবস্থায় যেহেতু হিন্দুরা ছিলেন পরিবর্তিত রাজশক্তির পক্ষে, সেহেতু হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এক নতুন দিগন্তপানে তাঁদের দৃষ্টি ফেরালেন। সুলতানী ও মুঘল আমলে মুসলিম কবিরা যেমন জাতীয় ও ভারতীয় উৎস ছাড়াও কাব্য প্রেরণার জন্য আরবী-ফারসী সাহিত্যের সঞ্চয়কে আত্মস্থ করে তার প্রকাশে মনোযোগী ছিলেন, এবার হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরা দেশের সীমানাতিক্রান্ত সাহিত্য-উৎস হিসেবে, প্রথমদিকে অন্ততঃ ফর্মের জন্য, ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হলেন। মুসলিম কবিদের অবস্থা থাকল আগের মতই। গদ্যরীতি গ্রহণ করলেন হিন্দু সাহিত্যিকরা; পদ্যে-গদ্যে পাশ্চাত্যধারায় প্রভাবিত হয়ে এগিয়ে চললেন নব উদ্যমে। আর অসহায় মুসলিম কবিরা বাধ্য হয়ে হাত দিলেন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এমন রচনায়, অবজ্ঞাভরে যা চিহ্নিত হল 'বটতলার পুঁথি' বলে। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লেন মুসলিম কবিরা। তখনই আবার দেশে কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় প্রচন্ড প্রতিরোধ সংগ্রাম। কার্যতঃ সে সংগ্রাম ছিল মুসলিম নিয়ন্ত্রিত এবং সে সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন মুসলিম কবিরাও। ইংরেজরা সে সংগ্রামকে 'ওহাবী' আন্দোলন বলে অভিহিত করে তার প্রভাবকে খর্ব করতে চাইলেও তা ছিল মুসলিম নেতৃত্বে পরিচালিত এদেশীয়দের মরণপণ মুক্তিসংগ্রাম। এ মনোভাবের প্রভাবে বিদেশী শাসক প্রভাবিত হিন্দু সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কৃতির প্রতিবাদেই যেন তাঁদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষাকে আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দের আধিক্য দিয়ে তাকে মুসলমানী রূপ দিতে চাইলেন। হিন্দু ও মুসলিম কবিরা আগে থেকেই তো দু'টি ভিন্ন খাতে নিজেদের লক্ষ্য অনুযায়ী তাঁদের কাব্য-কৃতিকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন, এবার দু'টি খাতের ভিন্নতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। খাত দু'টি এবার সম্প্রদায়গত না থেকে অনেকটাই সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল।

উপরোক্ত কবিদের কাব্য-কৃতির এই হল পটভূমি। কাব্যগুলোর শ্রেণীবিভাগে দেখা যায়, ধর্মীয় কাব্য এবং কাহিনী কব্যের সংখ্যা প্রায় সমান। অন্য ধরনের কাব্য-কৃতি এখানে অনুপস্থিত। ডক্টর হকের মতে, এইসব কাব্যে "সাহিত্য আছে, রস আছে, শিল্পও আছে। তবে তাহার বেশীর ভাগই মোগলাই।"

আঠার শ' সাতান্ন-আটান্ন'র মুক্তি-প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেল; মুঘল ঐতিহ্যের পরিমন্ডলে কাব্যচর্চায় উপরোক্ত মুসলিম কবিদের দিনও গত হয়ে গেল। ইংরেজ

www.pathagar.com

সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল ভারতবর্ষে। মুসলিম সাহিত্যসেবীরা দেখতে পেলেন, আলো ঝলমল সেই নিরুদ্বিগ্ন দিনে হিন্দু সাহিত্যসেবীরা তাঁদের পথ পরিক্রমায় বহুদূর এগিয়ে গেছেন। ১৮০০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকের অক্লান্ত চেষ্টায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য হল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে-সাহিত্য ততদিনে হিন্দু ঐতিহ্যবাহী। মুসলিম সাহিত্যিকরা স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করলেন, হিন্দু সাহিত্যিকদের কাছ থেকে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য সৃষ্টির আশা বাতুলতা মাত্র।

এই অনুভবের প্রেক্ষিতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে মুসলমানদের বিলম্বিত পদক্ষেপ। বাস্তবতার তাগিদে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া ছাড়া মুসলিম 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর আর কোন গত্যন্তর রইল না। ভীরু ও ধীর পদক্ষেপে নবজীবনের পথে এগোলেন তাঁরা। এগোলেন সাহিত্যের পথেও। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি মীর মোশাররফ হোসেন, 'সাহিত্য-সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) কনিষ্ঠ সমসাময়িক। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নাবতী' উপন্যাস। ৪০ বছরেরও বেশি সাহিত্য সাধনাকালে তিনি 'বিষাদ সিন্দু'সহ রচনা করেন প্রায় ৩০টি গ্রন্থ। তাঁরই প্রদর্শিত পথে এগিয়ে আসেন অন্যরাও। নীচে দেয়া হল 'আধুনিক' মুসলিম সাহিত্যিকদের একটি তালিকা। আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের এঁরা প্রথম দল।

তালিকা—ছয়

কবি-সাহিত্যিকদের নাম	জীবন/রচনা-কাল	তাঁদের সাহিত্য-কৃতি
মীর মোশাররফ হোসেন	১৮৪৮-১৯১১	রত্নাবতী, বিষাদ সিন্ধু, মদীনার গৌরব, জমিদার দর্পণ প্রভৃতি উপন্যাস-নাটক-ধর্মীয় রচনা প্রায় ৩০টি গ্রন্থ
কায়কোবাদ	১৮৫৮-১৯৫১	অশ্রুমালা, মহাশ্মশান কাব্যসহ বেশ কটি গ্রন্থ
কবি দাদ আলী	১৮৫৬-১৯২৭	ভাঙ্গাপ্রাণ, শান্তিকুঞ্জ, আশেকে রসূল, অন্তিমে মৃত্যু
শেখ আবদুর রহীম	১৮৫৯-১৯৩১	'সুধাকর' 'মিহির ও সুধাকর' ' মোসলেম-হিতৈষী' সংবাদপত্রের সম্পাদনাসহ প্রায় ১১টি গ্রন্থ
মোজাম্মেল হক	১৮৬০-১৯৩৩	কুসুমাঞ্জলী, প্রেমহার, জাতীয় ফোয়ারাসহ ১৫টি গ্রন্থ

www.pathagar.com

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	১৮৬১–১৯০৭	মিশনারীদের বক্তব্য বিরোধী এই সুবক্তার বেশ কিছু গ্রন্থ
আবদুল করীম সাহিত্য–বিশারদ	১৮৬৯–১৯৫৩	দুই হাজারের মত পান্ডুলিপির সংগ্রাহক ও প্রাবন্ধিক
মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী	১৮৭৫–১৯৫০	খগোল শাস্ত্রে মুসলমান, ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, ভারতে মুসলমান সভ্যতা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুবক্তা ও সমাজসেবক

তাছাড়াও ওই সময়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন যেসব কবি–সাহিত্যিক, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, ডাক্তার আবুল হোসেন, মৌলভী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ, তসলিম উদ্দীন আহমদ, মুনশী মোহাম্মদ জমীরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মৌলভী আব্বাস আলী, কবি আরজুমন্দ আলী, কবি আবু মা'লি মোহাম্মদ হামিদ আলী, আবদুল হামিদ খান ইউসুফ জায়ী, মওলানা রুহুল আমীন প্রভৃতি।

এঁদের সাহিত্য–কৃতি সম্পর্কে 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ইহাদের দান সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনকে বাদ দিলে সেই যুগের অন্যান্য হিন্দু সাহিত্যিকদের তুলনায় ইহাদের সাহিত্যিক দান উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা–দীক্ষা বাঙালী হিন্দুর মধ্যে হিন্দু ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছিল। ঠিক তেমনিভাবে পাশ্চত্য শিক্ষা–দীক্ষায় অল্প হইলেও এই শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছে।.....

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা মূলতঃ এক–একেবারেই এক; ইহাকে আত্মবিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া নামে অভিহিত করা যায়।

আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচিতি ঘটে। এইখানে আসিয়াই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন পথ ধরিল। তাঁহারা বুঝিলেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুই এবং মুসলমান মুসলমানই, তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া একজাতি হইতে পারে নাই ও পারিবে না। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিলেন, মধ্যযুগের বিশেষ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়ের হিন্দু–মুসলমান সংস্কৃতি–সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।" (পৃঃ ৩১৭)।

উপরোক্ত তালিকার কবি–সাহিত্যিকগণ এই বোধ থেকেই প্রাচীন মুসলিম কাহিনী, ইতিহাস থেকে শৌর্য–কথা ও বীরত্ব গাঁথা তুলে ধরে জীবনমৃত মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সফল হয়েছিল।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক বোধের এই বাস্তবতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের যুক্তিতে প্রশাসনিক সুব্যবস্থার কারণে, বাংলা বিভক্ত হয়ে গঠিত হয় দু'টি প্রদেশঃ ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ এবং বিহার-উড়িষ্যার অঞ্চলাদি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ গঠন ছিল মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু হিন্দু স্বার্থে ঘাটতি পড়ায় ধনে-জ্ঞানে উন্নততর বাঙ্গালী হিন্দুরা এ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। এর আগে ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল; ১৯০৬ সালে গঠিত হল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর রহিত হয়ে গেল প্রদেশ গঠনের এই ব্যবস্থা। কয়েক বছর পর ক্ষুব্ধ মুসলিম মনোভাবকে শান্ত করার লক্ষ্যে ১৯২১ সালে চালু করা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ওদিকে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য ভাবদীপ্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির যে সাধনা আরম্ভ হয়, তা পূর্ণতা লাভ করে বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) অবদানে। আর এদিকে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রেরণায় বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গনে যে দ্বিতীয় দলটি এগিয়ে এলেন, তার পুরোভাগে ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। এঁদের সাহিত্য-কৃতি একাধারে বহুমুখী এবং সংখ্যায়ও অনেক। তাই তাঁদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে গ্রন্থাদির নামোল্লেখ না করে শুধুমাত্র নাম আর বন্ধনীর মধ্যে জীবনকাল দিয়েই তা শেষ করছি। তাছাড়া উল্লেখিতদের সাহিত্য-কৃতি সম্পর্কে অনেকেই সুপরিচিত। এই সাহিত্যিকবৃন্দ হচ্ছেনঃ অনল প্রবাহ, রায়নন্দিনী, প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৭০-১৯৩১); ধর্মীয় গ্রন্থাদির প্রণেতা খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ (১৮৭৮-?); 'আনোয়ারা' ও অন্যান্য উপন্যাস রচয়িতা মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯৩৫); রূপজালাল-এর লেখিকা নওয়াব ফয়জুন্নিসা চৌধুরানী (১৮৩০-১৯০৩); 'অবরোধ বাসিনী', 'মতিচূর' প্রভৃতির লেখিকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত (১৮৮০-১৯০২); 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসখ্যাত কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৭); ইকরামুদ্দীন (১৮৮২-১৯৩৫); শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬); মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৩৮-১৯৬২); স্বনামখ্যাত সুপন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯); মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮); ডাঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৭-১৯৩৬); এস ওয়াজেদ আলী (১৮৮৮-১৯৫১); কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩); শেখ মুহম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৫৪); ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮); কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪); মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪); মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৬-১৯৬৩); কাজী আকরাম হোসেন (১৯৮৬-১৯৬৩); আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮); কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১); মাহবুবউল আলম (১৮৯৮-১৯৮১); আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৪); এবং কাজী নজরুল

www.pathagar.com

ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এই উল্লেখ থেকে নিশ্চয়ই কিছু কিছু নাম বাদ পড়েছে, তবে তা স্মরণে না আসার জন্য। তাছাড়া, প্রবন্ধে আমরা বিশ শতকে জন্মগ্রহণকারী কবি-সাহিত্যিকবৃন্দের নামোল্লেখ করেই ইতি টানছি।

'মুসলিম বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "অতঃপর, বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভব হইল, তিনি বাংলার খ্যাতনামা কবি নজরুল ইসলাম। তাঁহার আবির্ভাবে শুধু মুসলিম সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল। তিনি বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগের অবসান ও নূতন যুগের আগমন বার্তা ঘোষণা করিলেন।" (প্রঃ ৩৩৩)।

এই নূতন যুগ নির্যাতিত মানবতার বন্ধন-মুক্তির যুগ; মানুষকে মানুষেরই মর্যাদাদানের, তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ও শান্তিময় বিশ্ব রচনার মহান লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামী যুগ। এ যুগের সংগ্রামীকে দূর করতে হয় মৃত্যু-ভয়, ছিন্ন করতে হয় ক্ষুদ্রতার বন্ধন আর মিথ্যার মায়াজাল। ব্রজ-নির্ঘোষে নবযুগের যৌবন-দিপ্ত কবি এ বাণীই ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা বিপ্লবী ইসলামের মর্মবাণীরই ঘোষণা। এমনি ঘোষণার অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন এতদিনকার মুসলিম সমাজ-সেবক আর কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ। বিশ শতকে পৌঁছে তারুণ্য-চঞ্চল এই কবির ঘোষণায় ইসলামের সে মর্মবাণীকেই যেন খুঁজে পেলেন তাঁরা। হঠাৎ করেই জীয়ণ-কাঠির ছোঁয়ায় যেন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের পরিমন্ডল। দেশ-দেশান্তর ও ভাষা-ভাষান্তরের মনীষা-সঞ্চয় থেকে আহরিত বিষয়-বৈচিত্র্যে আর শব্দ-সম্ভারে নজরুল সাহিত্য যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম মানস প্রত্যাশিত এক অনুপম স্বপ্ন-বর্ণালী! অস্পষ্টতা আর বিভ্রান্তিকর পরিবেশে এমনি এক বর্ণালীর সন্ধানেই ছিল যেন শত শত বছরের মুসলিম সাহিত্য-চর্চার পথ পরিক্রমা! এখন আর রইল না কোন অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। ইংরেজ আমলে পিছিয়ে পড়া অর্ধ-চেতন জাতি সহসাই হল এক সংগ্রামী কাফেলা।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের ধারায়
একুশে ফেব্রুয়ারী

পৃথিবীর যে কোন ভাষা ও সে ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরম মর্যাদার স্বীকৃতি হচ্ছে কোন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দুভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল; তারপরও সেই মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চলেছে দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা। কিন্তু এই ১৯৫৬ সালে উপনীত হতে আমাদের পেরিয়ে আসতে হয়েছে কয়েক বছরের রক্তঝরা এক সংগ্রামী পথ। পথচলা আরম্ভ হয়েছিল সেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিন পর থেকেই। আমাদের পথে পড়েছিল কারবালা; ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী, শহীদানের রক্তলাল সেই অমর মহান একুশে ফেব্রুয়ারী।

মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষকাল থেকে আরম্ভ করে স্বাধীন সুলতানী আমল ও মুঘল আমল হয়ে ইংরেজ আমলে তার ক্রম পরিণতি ও গতি-প্রকৃতির একটা পরিসংখ্যানমূলক রূপরেখা যদি তুলে ধার যায় তাহলে সেই রূপরেখায় পরিস্ফুট বৈশিষ্ট্যগুলো হবেঃ

(এক) বাংলাদেশে তের শতকে মুসলিম শাসনামল আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের সর্বেসর্বা; সরকারী ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সেই দেব-ভাষা সংস্কৃতে রচিত দেবগ্রন্থে শূদ্র বা অব্রাহ্মণ জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সদা-সতর্ক। এমতাবস্থায় অদেব-ভাষা বাংলার উৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। ফারসী ভাষা সরকারী ভাষায় পরিণত হয়। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থায়।

(দুই) সমগ্র বাংলা একই সময়ে মুসলিম শাসনের আওতাভুক্ত হয়নি; সমগ্র বাংলা বিজয়ের প্রক্রিয়ায় সময় লেগেছিল প্রায় দু' শ' বছর। এই দু' শ' বছরকে আমরা বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল বলতে পারি; আর এই কালটা ছিল এখানে-ওখানে যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল। অন্যদিকে এই কালটাকে বাংলায় বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সমন্বয়ে একটি মুসলিম সমাজ ও ইসলামী পরিবেশ গড়ে ওঠার কাল বলেও অভিহিত করা যায়। এই কালের প্রথম থেকেই ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও

www.pathagar.com

বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা উল্লেখের দাবীদার। সে-যুগে মুসলমানদের মধ্যে অন্য দেশের ভাষা বা বিভিন্ন দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে হীনমন্যতা ছিল না। উত্তরাধিকার হিসাবে আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষিত বহিরাগত মুসলমানগণ এ দেশে বসবাসকালে বাংলা ভাষাকেও আয়ত্ত করে নিজেদের ভাষা করে নেয়।

তের শতকের প্রথম দিকে, ১২১০-১২১২ সালের মধ্যেই, আরবী ও ফারসী ভাষায় যে বইটি প্রথম লিখিত হয়, তা ছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দু যোগ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'অমৃতকুন্ড'-এর অনুবাদ। আরবী -ফারসীতে রচিত হয় আরও অনেক গ্রন্থ, দেশের নানা স্থানে স্থাপিত শিক্ষালয়ে এবং সুফী-সাধকদের প্রতিষ্ঠিত খানকায় চলতে থাকে ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের চর্চা। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার ঘটতে থাকে এবং দেশে গড় ওঠে একটা ইসলামী পরিবেশ।

(তিন) পনের শতক থেকে দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আরম্ভ হয় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ প্রক্রিয়া। ডক্টর আবদুল করিমের কথায়, বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি মুসলমান শাসনের অবদান। অতিরঞ্জন মনে হইলেও কথাটি সত্য। (বাংলার ইতিহাস,পৃঃ ৫২৫) বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ বা তাঁদের হিন্দু-মুসলিম অমাত্যগণ হিন্দু কবিদেরকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন, লিখিত হচ্ছে হিন্দু ধর্মীয় কাব্য। কিছুদিন পর মুসলিম কবিরাও এগিয়ে এসেছেন বাংলা সাহিত্যের চর্চায়। এই স্বাধীন সুলতানী আমলের স্মরণীয় কবিদের মধ্যে রয়েছেন একদিকে কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি আর অন্যদিকে শাহ মুহম্মদ সগীর, শেখ কবীর, জৈনুদ্দিন, সাবিরিদ খান, শেখ ফয়জুল্লাহ প্রমুখ। এঁদের কাব্য-কৃতিতে পার্থক্য ছিল বিষয়বস্তুগত। হিন্দু কবিরা যখন রচনা করছেন তাঁদের নিজেদের ধর্মীয় কাব্য, মুসলিম কবিরা তখন রচনা করে চলেছেন মুসলিম ধর্মীয় কাব্যের সঙ্গে হিন্দু ধর্মীয় কাব্য, প্রেমমূলক কাহিনী-কাব্য, বীরগাঁথা, রম্যকথা এবং নীতিমালার কাব্যসুষমা। মুসলিম কবিরা কাব্যকে নিয়ে এসেছেন মানুষের ভুবনে। বিষয়-বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে মুসলিম কবিরা ছাড়িয়ে গেছেন হিন্দু কবিদের।

(চার) মুঘল আমলে বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বিরাজমান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছেঃ (১) রাজানুগ্রহ ছাড়াই বাংলা সাহিত্যের ততদিনে অর্জিত অভ্যন্তরীণ শক্তিতেই এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা লাভ, (২) শিয়া প্রভাবে বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের সৃষ্টি, (৩) সম্রাট আকবর কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় প্রয়াস এবং যথেচ্ছা ব্যাখ্যায়িত ও অসংগঠিত 'সুফীবাদে'র প্রভাব সম্বলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলিম কাব্যচর্চায় নিজ নিজ পরিচয়-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ, এবং (৪) বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিক ধারায় ইউরোপীয়, বিশেষ করে পর্তুগীজ-সংস্কৃতির, মিশ্রণ। এই আমলে মুসলিম কাব্যাঙ্গন হয়ে ওঠে কর্মমুখর। হিন্দু-মুসলিম কবিদের

www.pathagar.com

কাব্যচর্চা ততদিনে হয়ে উঠেছে সম্প্রদায়গত, কিন্তু আধুনিক অর্থানুযায়ী সাম্প্রদায়িক নয়।

(পাঁচ) অতঃপর ইংরেজ আমল। এই আমলে সরকারী ভাষা হিসাবে ফারসীর স্থলাভিষিক্ত হয় ইংরেজী। নিজেদের ধর্মীয় প্রচারণার উদ্দেশ্যে ইংরেজ মিশনারীরা এসে শামিল হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'সেবায়'। প্রচলিত হয় গদ্যরীতি, চালু হয় ছাপাখান। রাজশক্তির হাত বদলে খুশী হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ মিশনারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন, নতুন দিনে শুরু হয় তাঁদের নতুন পথ-পরিক্রমা। রাজানুগ্রহে তাঁদের এই পথ-পরিক্রমা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। অন্যদিকে রাজশক্তির পরিবর্তনে ক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও তাঁদের নিজস্ব কাব্যলোকের পরিমণ্ডলে চালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন পুরনো ধারার অসহায় কাব্য-কথা 'বটতলা'র পুঁথি। ফলে, হিন্দুদের তুলনায় এবার অনেক পিছিয়ে পড়লেন তাঁরা। অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন-বিধ্বস্ত তখন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়। কিন্তু এক সময়ে সেই মৃতপ্রায় দেহেও হল নব-প্রাণের সঞ্চার। পিছিয়ে থেকেও নতুন পথে চলতে আরম্ভ করলেন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ। মীর মোশাররফ হোসেন থেকে যে নতুন ধারার শুরু, তার প্রাণচঞ্চল বেগবান রূপের প্রকাশ কাজী নজরুল ইসলামে। কিন্তু এর পূর্বেই বাংলা সাহিত্য পুরোপুরি স্বাতন্ত্র্যমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের অসামান্য প্রতিভা দিয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিভাধর হিন্দু সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যকে যে রূপ-রস-ভাবধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাতে তা হয়ে দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদের ঐতিহ্যবাহী পুরোপুরি হিন্দু জাতীয়তাবাদী বাংলা সাহিত্য। তাঁদের এ সাহিত্য-প্রয়াসে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের কোন অবদান ছিল না, তাতে মুসলিম জীবনও ছিল অনুপস্থিত। বঙ্কিম-সাহিত্য ও তাঁর অনুসারীদের রচনায় যেসব মুসলিম রাজপুরুষের চরিত্র আনা হয়েছে, তা যেন প্রায় ছ' শ' বছর আগে মুসলিম শক্তির কাছে ব্রাহ্মণ্য-শক্তির পরাজয়-গ্লানির প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে ইতিহাসের চরম বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে এক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই চিত্রিত। মুসলিম আমলে বাংলা সাহিত্যের সেই উন্মেষকাল থেকেই হিন্দু কবিদের অনুসরিত স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা পরবর্তীতে সম্প্রদায়গত বিশেষণে বিভূষিত হয়ে ইংরেজ আমলে একেবারেই মারমুখো সাম্প্রদায়িক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরম অবদানের পেলবতায় তা উদার রূপ-লাবণ্যে আবৃত হলেও মুসলিম জীবন তাতে অনুপস্থিতই থেকে যায়। বাংলা সাহিত্যে এ ভাবধারার পরিবর্তন লোক দেখানোভাবে আসে শুধুমাত্র তখন, যখন রাজনীতির অঙ্গণে হিন্দুদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সহযোগী হিসাবে মুসলিম সহযোগিতা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ'কে কেন্দ্র করে তার শুরু এবং তা চলতে থাকে চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। 'একই মায়ের সন্তান হিন্দু-মুসলমান' শব্দমালার উচ্চারিতকালের শেষার্ধে,

www.pathagar.com

১৯২০ থেকে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত সময়টাতে, কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি।

কাজী নজরুল ইসলাম কি স্বাতন্ত্র্যপন্থী ছিলেন অথবা সমন্বয়পন্থী? এ তো জানা কথা যে, যথার্থ অর্থেই তিনি ছিলেন নমন্বয়পন্থী। তাঁর রচিত সাহিত্যে জাতির নামে বজ্জাতি ছিল না। স্বাতন্ত্র্যবাদী অধিকাংশ হিন্দু সাহিত্যিকেরা যেমন করে শুধু বাহ্যতঃ ও প্রয়োজনের বেলায় সমন্বয় পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তেমন সমন্বয় পন্থার পথিক ছিলেন না কাজী নজরুল। বজ্জাতিমুক্ত ছিল তাঁর সমন্বয়-স্বপ্ন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "তাঁহার মতো এমন কবিরা মণে-প্রাণে, কাজে-কর্মে কোন বাঙ্গালী কবি নিজের দেশকে এবং দেশের জনগণকে ভালবাসিতে পারেন নাই, দেশের জনগণের ভালবাসাও এমন করিয়া আর কেহ পান নাই।.....মানুষকে মানুষ হিসাবে মানুষেরই মর্যাদা দিতে হইবে, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নজরুল একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।...ইহাই নবজাগ্রত ইসলামের সনাতন বাণী।.....ইসলাম দুর্বলের ধর্ম নহে, শৌর্যবীর্য ও পৌরুষই ইহার প্রাণ; সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমই ইহার সৌন্দর্য; অধিদেশীয়, অধিবর্ণীয় এবং অধিকালীন প্রকৃতিই ইহার পরম বৈশিষ্ট্য, এই সত্য অতি প্রাচীন হইলেও নজরুল-সাধনায় নতুন রূপ ও অভিনব মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এতদিন বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকেরা যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম ছিল, সমাজ ছিল, ইতিহাস ছিল, সংস্কৃতি ছিল; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ, প্রকৃত 'সাহিত্য' ছিল না। তাঁহারা যে পরশমণির সন্ধানে যুগ-যুগান্তর কাটাইয়াছিলেন, হঠাৎ কিংবা শতাব্দীর গোড়ায় আসিয়াই যেন নজরুলের মধ্যে তাহা আবিষ্কার করিলেন।" (মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃঃ ৩৩৬-৩৩৮)। কিন্তু ১৯৪২ সালে চিরদিনের মত নির্বাক হয়ে গেলেন নজরুল।

ইতোমধ্যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য-শাসিত ও ইংরেজ-উৎসাহিত স্বাতন্ত্র্যবাদের বৃক্ষ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে; হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ-সংঘাত চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অতঃপর ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন ও পাকিস্তানের প্রতষ্ঠা।

নজরুলের 'সমন্বয়' ধারণার বিজয় হলেই বাংলার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটা হত আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আদর্শস্থানীয় সে ব্যবস্থাটা কি রূপ নিতে পারত এই বাংলায়? এখানে স্মরণযোগ্য যে, বাংলায় মুসলিম শাসনের অন্যতম অবদানই ছিল একাধারে ব্রাহ্মণ্য কঠোর শাসনের নিগড় থেকে বাংলার অব্রাহ্মণ হিন্দু-বৌদ্ধ মেধার মুক্তি দান এবং পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দান। তারপর সেই সাহিত্য বিকাশের ধারাকে আরও বেগবান করে তুললেন মুসলিম কবিবৃন্দ। মুসলিম কবিদের কাব্য-কৃতিতে সমন্বয়-ধারণার পরিচয় পাওয়া গেলেও 'মুসলিমদের বাংলা বিজয়' জনিত সেন্টিমেন্টাল কারণেই সম্ভবত হিন্দু কবিদের কাব্য-কৃতিতে প্রতিফলিত হয়ে

www.pathagar.com

এসেছে স্বাতন্ত্র্যের ধারণা, সেই প্রথম থেকেই। এই 'মুসলিমদের বাংলা বিজয়'জনিত বিদ্বেষটা স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু-সমাজের সচেতন অংশে বিদ্যমান ছিল। একথারই প্রমাণ পাওয়া যায় ঋষি বঙ্কিম রচিত 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যেখানে তিনি বলেন, "মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল।" ১৩৯৪ সনের ১৩ অগ্রাহয়ণ "আনন্দবাজার" পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে শ্রী গৌতম রায়ও বলেন, "মুসলিম রাজশক্তির উচ্ছেদ করে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রেক্ষাপট হিসেবে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ও হিতবাদী দার্শনিকরা অষ্টাদশ শতকে যে ভাবাদর্শগত জমি তৈরী করেছিলেন, স্বভাবতই সেখানে সংস্কৃতি সমন্বয় ও সম্প্রদায়িক সংহতির মুসলিম ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উহ্য রাখা হল। আর সেই জমিতেই উনিশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আবাদ করলেন বিষবৃক্ষ।" সুতরাং বাস্তবতার নিরিখেই জন্ম নিল পাকিস্তান।

হিন্দুদের 'রেনেসাঁ' এসেছিল "ইংরেজের বাংলা বিজয়ের" পরেই। বাস্তবতা-ভিত্তিক ধারণা থেকে বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও সেদিন পাকিস্তান সৃষ্টিকে স্বাগত জানালেন বাংলার মুসলিমদের জন্য এক 'রেনেসাঁ'র প্রতিশ্রুতি হিসাবে। তাই তো সেদিন সর্বজনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ্ বাহার, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের ও অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকরা কলকাতায় গড়ে তোলেন 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি।'

একই চিন্তাধারায় কিছুদিন পর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, মাযহারুল হক প্রমুখ সুধীবৃন্দ দ্বারা ঢাকায় গড়ে উঠেছিল এ 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। একই চিন্তাধারা, একই স্বপ্ন। সেই স্বপ্নে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে ও সাহিত্যে যে রেনেসাঁ আসবে তার মূলনীতি হবে ইসলামভিত্তিক আর ভাষা হবে বাংলা। শাহ্ মুহম্মদ সগীর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম-এতদিনকার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদেরই স্বপ্নের রূপায়ণ যেন!

কিন্তু নতুন মুঘল শাসকরূপে আবির্ভূত হলেন যেন পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের আগেই জুলাই মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্বদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর জিয়াউদ্দিন অভিমত প্রকাশ করলেন, উর্দুরই হওয়া উচিত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার উত্তরে আজাদ পত্রিকায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সে-বক্তব্যের যুক্তি খন্ডন করে লিখলেন প্রবন্ধ। প্রায় একই সময়ে 'সওগাতে' বাংলার সপক্ষে এক কড়া প্রবন্ধ লিখলেন ফররুখ আহমদ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল পোস্ট কার্ড মানি-অর্ডার ফর্ম প্রভৃতিতে ইংরেজী শব্দের পাশে শুধু উর্দু শব্দ মুদ্রিত। বাংলাভাষীদের সচেতন অংশে দেখা দিল সন্দেহ। বাংলাভাষার মর্যাদার প্রশ্নে তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগল। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর গঠিত হল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিস'। এর সেক্রেটারী ছিলেন সেদিনের ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেম। সদস্য ছিলেন সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, ফজলুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ তরুণেরা।

বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে তখন কানাঘুষা আরম্ভ হয়েছে, সন্দেহ দানা বাঁধছে। এমনি অবস্থায় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষীয়গণকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিল তমদ্দুন মজলিশ। '৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাশেম তমদ্দুন মজলিশের পক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তার শিরোনাম ছিলঃ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা–বাংলা না উর্দু?' তাতে প্রবন্ধ লেখন সর্বজনাব আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ও অধ্যাপক আবুল কাশেম। তাঁরা জোরালো যুক্তিসহ বাংলা ও উর্দু দু'টি ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত বলে মতে প্রকাশ করেন।

এর মধ্যে ভরতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়েছে হিন্দী। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের চিন্তাভাবনাও তার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রকাশ পেতে লাগল—পাকিস্তানেরও একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু।

বাংলা ভাষার সপক্ষীয়রা আরও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এমনি অবস্থায় জনমত সংগঠন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গঠন করা হল এক সংগ্রাম পরিষদ; তার কনভেনর হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া। বাংলার দাবীতে সভা–সেমিনার হতে লাগল ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরের দিকে পাকিস্তান সুপিরিয়ার সার্ভিস পরীক্ষার ব্যাপারে একটা সার্কুলার জারি হল; তাতে পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়সূচীতে, ইংরেজী–উর্দূ–হিন্দী–সংস্কৃত–ফরাসী–জার্মানী–ল্যাটিন ইত্যাদি অনেক ভাষার উল্লেখ থাকলেও বাংলা ভাষার কোন উল্লেখ ছিল না।

এর বিরুদ্ধে তমদ্দুন মজলিশের অধ্যাপক আবুল কাশেম পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন। কিন্তু সে বিবৃতি ছাপা হলো শুধু জনাব আবুল মনসুর সম্পাদিত পত্রিকা কলকাতাস্থ 'ইত্তেহাদে'। সম্পাদকীয়তেও এই প্রতিবাদের সপক্ষে মত প্রকাশ করা হল। ইত্তেহাদের এই সংখ্যা ঢাকায় এসে পৌছল যখন তখন বাংলাভাষার সপক্ষীয়দের ক্ষোভ চরমে উপনীত হল। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল পূর্ব–পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ। তমদ্দুদন মজলিশের সদস্য জনাব শামসুল আলম সেই ছাত্র লীগেরও অন্যতম সদস্য। নতুন করে সংগ্রাম পরিষদ পুনগঠিত হল যার কনভেনর করা হল জনাব শামসুল আলমকে।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ এই পুনগঠিত সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে পালিত হয় রাষ্ট্রভাষা দিবস। ঘেরাও করা হয় সেক্রেটারিয়েট; চালিত হয় পুলিশের হামলা, আহত এবং গ্রেফতার হন অনেকেই। বিক্ষুব্ধ ছাত্র–জনতা প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ ও খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালকে ভাষার দাবীর জন্য পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করে।

www.pathagar.com

কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসবেন বলে এসব প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শান্ত করতে ব্যস্ত হন তখনকার প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন। ১৫ই মার্চ তিনি সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা দাবী মেনে নিয়ে তা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন। জিন্না সাহেব ঢাকায় এলেন, বক্তৃতা দিলেন ২১ মার্চ ঘোড়দৌড় মাঠে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে। সেসব বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সংহতির জন্যই তার রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দূ। বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের মধ্য থেকে 'না না' ধ্বনিতে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। নেতা হিসাবে জিন্নাহ সাহেব তখনও বেশ জনপ্রিয়। ফলে আন্দোলন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও ছাইচাপা আগুন হয়ে জ্বলতে থাকল।

আটচল্লিশের অভিজ্ঞতা থেকে নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করে ১৯৪৮ সালের ১৪ই নভেম্বর অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে এবং কথাশিল্পী শাহেদ আলী ও মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় ১৯, আজিমপুর রোড থেকে প্রকাশিত হল ভাষা সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক 'সৈনিক'। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। তার সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সহসভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন টাঙ্গাইল নিবাসী জনাব শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মুশতাক আহমদ। ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। নবোদ্যমে আরম্ভ হল রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম। তৃতীয়বারের মত পুনর্গঠিত হল সংগ্রাম পরিষদ; এবার তার কনভেনর হলেন কাজী গোলাম মাহবুব। বাংলা ভাষার দাবীতে একুশে ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

অতঃপর ১৯৫২ সালের সেই একুশে ফেব্রুয়ারী, সেই মহান দিবসের শোকাবহ স্মৃতি ও মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দুর্জয় সঙ্কল্পের প্রকাশ। সে প্রকাশে মেশানো ছিল শাহ সগীর- সৈয়দ সুলতান-দৌলত কাজী-আলওল-নজরুল প্রমুখ কত না কবির কণ্ঠস্বর! স্বাধীন সুলতানী আমলে মর্যাদা পেয়েছিল আমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষার কবিরা পেয়েছিলেন রাজোৎসাহ; মুঘলরা সে উৎসাহদানে ছিল উদাসীন। কিন্তু ইংরেজ আমলে পর্যুদস্ত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা আবার নবজীবনের পথে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন তাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল সাতচল্লিশোত্তর নতুন মুঘলেরা। কিন্তু নজরুলের উত্তরসূরী আমরা তার মোকাবেলা করেছি সফলভাবে। শহীদী প্রাণের নজরানা দিয়ে আমাদের তরুণেরা প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলা ভাষার মর্যাদা। বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর একটি মাত্র স্বাধীন দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, সে-দেশ আমাদের বাংলাদেশ। মহান একুশের শহীদানের প্রতি আজ আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম, হাজারো সালাম।

www.pathagar.com

আমাদের সাহিত্যচর্চায়
মহান একুশের তাৎপর্য

বাংলা সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে এই আলোচনার প্রারম্ভেই দু'টি শব্দ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ব্যক্ত করে নিতে চাই। সমন্বয় শব্দটার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংগতি, অবিরোধ, মিলন, আর সমাহার শব্দটার অর্থ সংগ্রহ, সমষ্টি ইত্যাদি। যেখানে একাধিক মত ও জীবন-বিশ্বাস বিদ্যমান, সেখানে সে সবের সমন্বয় সাধনের অর্থ হবেঃ সকল মত ও জীবন-বিশ্বাস মিলিয়ে এমন একটা কিছু দাঁড় করানো যা নিয়ে কারও বিরোধের কোন অবকাশ থাকবে না। সমাহারের বেলাতেও তা-ই। সেই 'একটা কিছু'র সন্ধানে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হলে যা পাওয়া যাবে তা হবে প্রতিটি মত-বিশ্বাস থেকে আহরিত অভিন্ন উপাদান-বিশিষ্ট 'একটা কিছু' যা থেকে প্রতিটি মত-বিশ্বাসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বাদ যাবে; আর সমাহারের পথে অগ্রসর হলে পাওয়া যাবে এমন 'একটা কিছু' যা থেকে প্রতিটি মত-বিশ্বাসকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোসহ চিহ্নিত করা যাবে।

দীর্ঘকালের কোন একটা বিশেষ মত-বিশ্বাস যদি কোন সাহিত্যে তার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে থাকে, তাহলে তাতে অন্য মত-বিশ্বাসের সমন্বয় করতে গেলে তা বাস্তবে মার খেয়ে যেতে পারে, এমন কি বিলীনও হয়ে যেতে পারে। মানুষ তো সুযোগ পেলেই স্বার্থবাদী হয়! কিন্তু সমাহারে সে সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ থেকে আজ বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে প্রায় চেনাই যায় না। এই দুই সংস্কৃতির সমাহারে এমনটি হত না।

ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মুসলিম সাহিত্যিকরা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট চরম বিপর্যয়ের মধ্যে অনেক বিলম্বে আধুনিক সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে এসেছেন। ততদিনে আধুনিক বাংলা সাহিত্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বাংলা ভাষাতেও ততদিনে সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ-সম্ভারে আরবী-ফারসী-তুর্কী ভাষা থেকে আহরিত শব্দমালার স্থান দখল করে নিয়েছে সংস্কৃত ও সংস্কৃতায়িত শব্দমালা। তখন আর সাহিত্যে প্রচলিত সেই শব্দ-সম্ভারকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না মুসলিম সাহিত্যিকদের পক্ষে। কখনও মুসলিম মানসের উপযোগী রূপকল্প নির্মাণে বাধ্য হয়ে তাদের জীবন-ধারার সঙ্গে জড়িত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করলেও তার পাশে বন্ধনীভুক্ত করে দিতে হত সেসবের

www.pathagar.com

সংস্কৃতায়িত প্রতিশব্দ। ফলে, মীর মোশাররফ হোসেন থেকে আরম্ভ করে মওলানা ইসলামাবাদী পর্যন্ত চলল এই শাব্দিক ভারবাহিতার কাল, বলা চলে মানসিক আড়ষ্টতার কাল।

অতঃপর দেখা দিল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডকটর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচিতি ঘটে। এইখানে আসিয়াই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন পথ ধরিল। তাঁহারা বুঝিলেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুই এবং মুসলমান মুসলমানই, তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া একজাতি হইতে পারে নাই ও পারিবে না। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিলেন, মধ্যযুগের বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়ের হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।" (পৃ. ৩১৭)।

আরম্ভ হল নতুন অধ্যায়। এই অধ্যায়ের শুরুতে ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেষে কাজী নজরুল। উপরোক্ত গ্রন্থে ডক্টর হক বলেন, "অতঃপর, বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইল, তিনি বাংলার খ্যাতনামা কবি নজরুল ইসলাম। তাঁহার আবির্ভাবে শুধু সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল। তিনি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগের অবসান ও নতুন যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করিলেন।...বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'যুগপ্রবর্তক কবি' নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রবল রবীন্দ্র-প্রভাবের বাহিরে থাকিয়া মুসলমানদের সাহিত্য-সৃষ্টির সাধনা সফল হইয়াছে।" (পৃ. ৩৩৩-৩৩৪)

এই নতুন যুগ নির্যাতিত মানবতার বন্ধন-মুক্তির যুগ, মানুষকে মানুষেরই মর্যাদা দানের যুগ, তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ও শান্তিময় বিশ্ব রচনার মহান লক্ষ্যে সংগ্রাম পরিচালনার যুগ। নজরুলের কথায়, এ যুগের সংগ্রামীকে দূর করতে হয় মৃত্যু-ভয় এবং ছিন্ন করতে হয় ক্ষুদ্রতার বন্ধন আর মিথ্যার মায়াজাল। বজ্র-নির্ঘোষে নবযুগের যৌবন দৃপ্ত কবি এ বাণীই ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা বিপ্লবী ইসলামের মর্মবাণীরই ঘোষণা। এমনি ঘোষণার অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন এতদিনকার মুসলিম সমাজ-সেবক আর কবি সাহিত্যিকবৃন্দ। কবির এই ঘোষণায় ইসলামের সেই মর্মবাণীকেই যেন খুঁজে পেলেন তাঁরা! হঠাৎ করেই জীবন-কাঠির ছোঁয়ায় যেন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন! দেশ-দেশান্তর ও ভাষা-ভাষান্তরের মনীষা-সঞ্চয় থেকে আহরিত রূপকল্প আর শব্দ-সম্ভারে নজরুল সাহিত্য যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের বহু-প্রত্যাশিত এক অনুপম স্বপ্ন-বর্ণালী। অস্পষ্টতা আর বিভ্রান্তিকর পরিবেশে এমনি এক বর্ণালীর সন্ধানেই ছিল যেন এতদিনকার মুসলিম সাহিত্যচর্চার পথ-পরিক্রমা! এখন আর রইল না কোন অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। ইংরেজ আমলে পিছিয়ে-পড়া অর্ধ-চেতন জাতি সহসাই পেল পথ-প্রদর্শকদের!

www.pathagar.com

হালে একটা ধারণা চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে খুব জোরেশোরে। ধারণাটা হচ্ছেঃ ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হিন্দু ও মুসলিম মত-বিশ্বাসের সমন্বয়ধর্মী, সাতচল্লিশের পর পূর্ব-পাকিস্তানে তাকে সাম্প্রদায়িক করে তোলা হয়েছিল; একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সকল সাহিত্য-সংস্কৃতসেবীর উচিত হবে সেই 'সাম্প্রদায়িক পথ ভ্রষ্টতা' থেকে ফিরে এসে প্রাক-সাতচল্লিশের সমন্বয়ের পথকে অনুসরণ করা। অর্থাৎ, মনে করতে হবে যে পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণাটা ছিল কলঙ্কজনক ও দুঃস্বপ্ন তাড়িত একটা ধারণা এবং চব্বিশ বছরের পাকিস্তান আমলে রচিত সকল সাহিত্য-কর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবন-ধারাকে মুছে ফেলে প্রাক-সাতচল্লিশের 'সমন্বয়ধর্মিতা'কে আঁকড়ে ধরতে হবে।

কলকাতা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'জিজ্ঞাসা' নামক এক সাহিত্য-সাময়িকীতে বাংলাদেশীয় এক প্রবন্ধকার একথা স্পষ্টই বলেছেন। অথচ সত্যটা সকলেরই জানা যে, প্রাক-সাতচল্লিশের 'সমন্বয়ধর্মিতা' বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তা ছিল আলোচনার প্রারম্ভেই বলে নেওয়া সেই সমন্বয়ধর্মিতা যাতে হিন্দু জীবন-বিশ্বাসের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল মুসলিম জীবন-বিশ্বাস। প্রসঙ্গত ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বসন্ত চ্যাটার্জি রচিত 'ইনসাইড বাংলাদেশ টুডে' গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। শ্রী চ্যাটার্জি লিখেছেন, "এখানকার (অর্থাৎ বাংলাদেশের-লেখক) শিক্ষিত মহল কর্তৃক আমরা এবং ভারত কি পরিমাণে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকি, তা বিচার করা যেতে পারে এই ঘটনা থেকে যে অনেক উচ্চাসীন আইনজীবী, ব্যারিস্টার, প্রফেসার ও অন্যান্য বিদ্বজ্জন আমাদের কাছে প্রাইভেট কথাবার্তায় অকপটভাবে গোপনে বলেছেন যে, 'তাঁরা আরও অনেক বেশী নিরাপত্তা বোধ করতেন ও সন্তুষ্ট হতেন, যদি ভারত তার সংবিধানে স্রেফ ৩৭১ নম্বর একটা উপচ্ছেদ সংযুক্ত করে সরাসরি এই প্রদেশটাকে তার একটা স্পেশ্যাল স্টেট হিসেবে পরিণত করে নিত।'...." (পৃ. ১৪২) হালে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে যে-ধারণাটা চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার উৎস-মূল কোথায় এবং উদ্দেশ্যটা যে কি তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাক-সাতচল্লিশের কলকাতা-কেন্দ্রিক সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সেদিন হিন্দু জাতীয়তাবাদ অনুপ্রাণিত ও প্রচারিত সমন্বয়ধর্মিতার কলরবে কাজী নজরুলই ছিলেন একমাত্র বিদ্রোহী ব্যতিক্রম। তাঁর রচিত সাহিত্যে তথাকথিত সমন্বয়ধর্মিতা ছিল না, ছিল সমাহারধর্মিতা। (কেউ কেউ তাঁকে 'সহাবস্থানপন্থী' বলতে চান। এ শব্দটা যথার্থ অর্থ বহন করলেও তা রাজনীতি ক্ষেত্রেই বহুল ব্যবহৃত বলে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা 'সমাহারপন্থী' শব্দটা গ্রহণেরই পক্ষপাতী।) কাজী নজরুলই প্রথম এই সমাহারের পথটি অনুসরণ করেছিলেন, এমনটি মনে করা সঠিক হবে না। বাংলা সাহিত্যের সেই উন্মেষখাল থেকে আরম্ভ করে তার বিকাশ ও পরিণতিকালের মুসলিম সাহিত্যিচর্চার স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করলেই দেখা যাবে, এই

www.pathagar.com

সমাহারের পথটিই প্রধানত অনুসরণ করে এসেছেন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা; হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরা অনুসরণ করেছেন, সমন্বয় সমাহার কোনটাই নয়, একেবারেই হিন্দু সাহিত্যের পথ। ফলে, বাংলা সাহিত্যচর্চায় সৃষ্ট হয়েছে হিন্দু ও মুসলিমদের নিজস্ব ঐতিহ্য-ধারা।

মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন কবির কাব্য-কৃতির পরিসংখ্যানে দেখা যায়ঃ (১) স্বাধীন সুলতানী আমলে জানামতে ৯ জন মুসলিম কবির মধ্যে অন্তত চারজন হিন্দু বিষয়াদি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন—'পদাবলী' রচয়িতা চাঁদ কাজী ও শেখ কবীর, 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতা সাবিরিদ খান এবং 'গোরক্ষবিজয়' রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ; অন্যান্য মুসলিম কবিরা রচনা করেছেন মুসলিম বিষয়-ভিত্তিক কাব্য। এই আমলে জানামতে ২৪ জন হিন্দু কবি সবাই হিন্দু ধর্মীয় কাব্য এবং একটি হিন্দু কাহিন্য-কাব্য, 'বিদ্যাসুন্দর', রচনা করেছেন। (২) মুঘল আমলে আমাদের জানামতে ২৯ জন মুসলিম কবির মধ্যে অন্তত পাঁচজন হিন্দু-বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন--'মধুমালতী' রচয়িতা মুহম্মদ কবীর, 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' রচয়িতা দৌলত কাজী, 'পদ্মাবতী' 'সতী ময়না' রচয়িতা মহাকবি আলাওল, 'ময়নামতীর গান' রচয়িতা শুকুর মাহমুদ এবং 'পদাবলী' রচয়িতা সৈয়দ মুর্তজা। এই আমলে ১৩ জন হিন্দু কবির সবাই রচনা করেছেন হিন্দু-বিষয়ক কাব্য। এই আমল সম্পর্কে আরও উল্লেখ্য যে, মুসলিম সুলতানদের অনেকেই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কবিবৃন্দকে বাংলা কাব্য-রচনার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন।

ইংরেজ আমলে, মুসলিম আমলের এই দু'টি ঐতিহ্য-ধারা আরও স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। রাজানুগ্রহ যতটুকু পাওয়ার, পেয়েছেন হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ। অনেক অনেক হিন্দু কবি-সাহিত্যিক তাঁদের অমূল্য অবদানে ভরে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার; কিন্তু মুসলিম জীবন-কথা তাতে অনুপস্থিত। একমাত্র ব্যতিক্রম ভাই গিরিশচন্দ্রের পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ। অথচ এই আমলের বিপর্যয়কালেও সৈয়দ হামজা রচনা করেছেন 'মধুমালতী', কবি চুহর রচনা করেছেন 'মনোহর-মধুমতী' এবং মীর মোশাররফ হোসেন রচনা করেছেন 'রত্নাবতী' উপন্যাস, 'বসন্ত কুমারী' নাটক এবং 'বেহুলা-গীতাভিনয়'।

সুতরাং কাজী নজরুল সাহিত্যচর্চায় সমাহারধর্মিতার মুসলিম ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছিলেন। আর তখনকার প্রতিভাধর হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরাও অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকেই; সে-ঐতিহ্য হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যাভিসারী ঐতিহ্য। অথচ এই ঐতিহ্যবাহীরাই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির তথাকথিত সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তখন, যখন ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হল। শুধু তখনই শোনা গেল 'একই মায়ের সন্তান আমরা হিন্দু-মুসলমান'! বিজয়ী মুসলিম

www.pathagar.com

শাসনামলে কিন্তু এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় নি!

১৯৪২ সালে চিরদিনের মত নির্বাক হয়ে গেলেন কাজী নজরুল। দীর্ঘ অতীতের বাস্তবতা থেকে আত্মবিশ্লেষণ-লব্ধ সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলমান তখন এক নতুন পথের পথিক। ইংরেজ আমলের শেষের দিনটি ক্রমাসন্ন; বাংলার বুকে হিন্দু মুসলমানদের স্বতন্ত্র লক্ষ্যানুসারী রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ। যে বিদেশী শাসনের প্রাক্কালে নবোত্থিত হিন্দু সমাজ 'কলোনিয়্যাল রেনেসাঁ'য় স্নাত হয়েছিল, সে-শাসনেরই অবসান-লগ্নে সুপ্তোত্থিত মুসলিম সমাজ মুক্ত জীবনের এক রেনেসাঁর আশায় হল অধীর আগ্রহী! নির্বাক কাজী নজরুলের উত্তরসূরীরা ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের আলোকে কলকাতায় এবং পরে ঢাকায় গড়ে তুললেন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪২ সালের ৩০ আগস্ট সর্বজনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, মুজিবুর রহমান খাঁ (কনভেনর), মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিক-সাংবাদিকবৃন্দ কলকাতায় বসে গড়ে তুললেন 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং কিছুদিন পরেই সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, অধ্যাপক মাযহারুল হক, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ সাহিত্যিক-সুধীবৃন্দ ঢাকায় গড়ে তুললেন 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। মুক্ত দিনের সূর্যালোকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে তাঁরা মনের মত করে সাজাবেন, তার আসনকে দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত করবেন; সকলের আশাভরা কল্পনা তখন নীলাকাশে মুক্ত শাহীন! [তিরিশের দশকে চলমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলার সুধী-সামজ যে সব চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং তাতে যে সব মতামত প্রকাশিত হয় তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তাঁর রচিত 'বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি' গ্রন্থের 'ইতিহাসের দর্পণেঃ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন' প্রবন্ধে (প্রকাশিত ১৯৮০)।]

অতঃপর বিভক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা পেল ভারতবর্ষ। এল সেই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট; প্রতিষ্ঠিত হল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে সংশোধিত হয়ে ' স্টেটস'-এর স্থলে সন্নিবেশিত হল 'স্টেট'। সর্বজনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু প্রমুখের স্বাধীন সার্বভৌম তৃতীয় রাষ্ট্র 'বৃহত্তর বাংলা'র স্বপ্নও ব্যর্থ হল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একগুয়েমীতে। তবুও খন্ডিত বাংলাতেই এ-জনপদবাসী জ্বালাল আশার প্রদীপ! প্রাণে প্রাণে তখন নব-জাগরণ, পুষ্পে-পল্লবে মৃদু শিহরণ, বনে বনে পাখীদের কল-গুঞ্জরণ! স্বাধীনতা!...কিন্তু..... পুনরাবৃত্তি ঘটলেও সেই 'কিন্তু'-সংক্রান্ত প্রধান ঘটনাবলীর রূপরেখা এখানে আবার তুলে ধরছি।

* পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন পরেই নতুন চালু পোস্ট কার্ড, মানি-অর্ডার ফর্ম ইত্যাদিতে দেখা গেল তাতে পরিচিতিমূলক ইংরেজী শব্দের

www.pathagar.com

সাথে শুধুমাত্র উর্দূ শব্দ রয়েছে। তাতে পূর্ব-বাংলার (পরে পূর্ব-পাকিস্তান) সচেতন নাগরিকদের মনে বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন জাগে।

এর কিছুদিন আগে, ১৪ আগস্টেরও আগে, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর জিয়াউদ্দীন এক প্রবন্ধে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র উর্দূর সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তার প্রতিবাদে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও একটি প্রবন্ধে সেই মত খন্ডন করেন।

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বরে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিস'। এর কনভেনর বা সেক্রেটারী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেম। সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব শামসুল আলম, জনাব ফজলুর রহামন ভূইয়া প্রমুখ তরুণেরা। এই তমদ্দুন মজলিসের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা।

* ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাশেম তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন যার শিরোনাম ছিল-'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-বাংলা না উর্দু?' তাতে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম। তাঁরা জোরালা যুক্তিসহ বাংলা ও উর্দূ দু'টি ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।
* এর মধ্যে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়েছে হিন্দী। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ভাবনাও তার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রকাশ পেতে লাগলঃ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দূ।
* পূর্ব-বাংলার সচেতন নাগরিকরা আরও ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কবি ফররুখ আহমদ সওগাতে প্রকাশিত প্রবন্ধে তার প্রতিবাদ জানালেন। এমনি অবস্থায় পূর্ব-বাংলার জনমত সংগঠন করার লক্ষ্যে এবং বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হল সংগ্রাম পরিষদ-যার কনভেনর হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূইয়া।
* ১৯৪৭ সালের নভেম্বরের দিকে পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার জন্য জারীকৃত সার্কুলারে পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহের তালিকা দেওয়া হলো তাতে ইংরেজী, উর্দূ, হিন্দী, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন প্রভৃতি অনেক ভাষারই উল্লেখ ছিল, ছিল না শুধু বাংলা ভাষার উল্লেখ।

এর প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হল ঢাকায়। অধ্যাপক আবুল কাসেম বিবৃতি দিলেন পত্রিকায়। পাকিস্তানের কোন পত্রিকায় তা ছাপা

www.pathagar.com

হলো না, ছাপা হলো কলকাতাস্থ ইত্তেহাদ পত্রিকায় যার সম্পাদক ছিলেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ। তিনি সেদিনের সম্পাদকীয়তেও এই প্রতিবাদের সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। এটা ডিসেম্বরের কথা। ইত্তেহাদের এই সংখ্যা ঢাকায় এসে পৌছল যখন, তখন বাংলা ভাষার সপক্ষীয়দের ক্ষোভ আরও চরমে পৌছল।

* এর মধ্যে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনাব শামসুল আলম তারও সদস্য, তমদ্দুন মজলিসের সদস্য তো আগে থেকেই ছিলেন। নতুন করে সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হলো; জনাব শামসুল আলম হলেন তার কনভেনর।

* ১৯৪৮ সালের ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী ও ২ মার্চে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের আইনবিধি সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে বাংলা ভাষার দাবী উত্থাপিত হলেও তা অগ্রাহ্য হয়। তার প্রতিবাদে ১১ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ঢাকায় পালিত হয় রাষ্ট্রভাষা দিবস। বিক্ষোভের অংশ হিসেবে ঘেরাও করা হয় সেক্রেটারিয়েট; বিক্ষোভকারীদের উপর চলে প্রচন্ড পুলিশ-হামলা; বহুজন আহত হন, গ্রেফতার করা হয় অনেককেই। বিক্ষোভকারীরা তদানীন্তন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ ও খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজলকে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করেন। বিক্ষোভ দমনের জন্য সেনাবাহিনীর ইউনিটও তলব করা হয়। শেষ পর্যন্ত পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখনও মুখ্যমন্ত্রী শব্দটা চালু হয়নি) খাজা নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা দাবীবিশিষ্ট এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে বিক্ষোভের অবসানঘটান।

* এই মার্চেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ আসেন ঢাকায়; ২১ মার্চ তিনি বক্তৃতা দেন রমনা ঘোড়-দৌড় মাঠে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে। দু'টি ভাষণেই তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। কার্জন হলের সভায় এই মত প্রকাশের সময় উপস্থিত ছাত্রনেতাদের 'না না' ধ্বনিতে তার প্রতিবাদ উত্থিত হয়।

* এই ২৪ মার্চে সর্বজনাব আবুল কাসেম, শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও শামসুল আলম সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

* ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষারূপে ঘোষণা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

* ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর ১৯ আজিমপুর রোড (অধ্যাপক আবুল কাসেমের

www.pathagar.com

বাসস্থান) থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে 'সাপ্তাহিক সৈনিক' যার সম্পাদনায় ছিলেন কথাশিল্পী শাহেদ আলী ও জনাব এনামুল হক এবং যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করা।

* ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ যার সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী; সহ-সভাপতি সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান ও আবুল মনসুর আহমদ; সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মুশতাক আহমদ।
* ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ অস্থায়ী অর্গানাইজিং কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুল মতিনকে আহবায়ক করে গঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি।
* পাকিস্তান গণপরিষদের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তার রিপোর্টে উর্দূকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে।
* ১৯৫০ সালের ৪-৫ নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য যে সুপারিশমালা পেশ করা হয় তাতে বাংলা ও উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ ছিল অন্যতম।
* ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল বাংলা ভাষার সপক্ষে মরণপণ সংগ্রাম। আবার পুনর্গঠিত হল সংগ্রাম পরিষদ, নাম হল 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'। বিভিন্ন দলের মধ্যে তমদ্দুন মজলিস ছাড়াও ছিল পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, যুবলীগ এবং অন্যান্যরা। কাজী গোলাম মাহবুব হলেন তার আহবায়ক।
* ৩০ জানুয়ারী, ১৯৫২ঃ খাজা নাজিমুদ্দীনের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় পালিত হয় প্রতিবাদ দিবস; বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির উদ্যোগে পুরনো কলাভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা, তার সঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট।
* ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫২ঃ পুরনো বার লাইব্রেরী হলে 'সর্বদলীয় কর্মীসভা'।

পরের দিন থেকে বায়ান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাস: ধর্মঘট, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও প্রস্তুতি সভার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারীর বিশটি দিনরাত পেরিয়ে আসে একুশে ফেব্রুয়ারী। ছাত্র-সমাজের হাতে তখন ভাষা-সংগ্রামের পতাকা। ঘটনাপঞ্জীর রূপরেখায় আমি আর এগুতে চাই না; কারণ বাকি ইতিহাস সকলের জানা।

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাভাষা স্বীকৃতি পেয়েছিল ১৯৫৬ সালে। সে স্বীকৃতি ছিল অনেক রক্তঝরা এক

www.pathagar.com

সংগ্রামের সাফল্য। সংগ্রামের এক রক্তলাল মাইল-ফলক একুশে ফেব্রুয়ারী। একুশে তাই আমাদের জীবনে এক মহান দিবসের স্মৃতি, অশ্রু-শোকাতুর অন্য এক কারবালার স্মৃতি, তারই সঙ্গে অনুপ্রেরণার অনন্য এক স্মারক উৎস!

আবার বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে শহীদী প্রাণের নজরানা দিয়ে কারা প্রতিষ্ঠিত করে গেল মায়ের মুখে শেখা ভাষা আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা? আমাদের ভা'য়েরা, আমাদের ছেলেরাই তো! শাহ্ সগীর, সৈয়দ সুলতান, দৌলত কাজী, আলাওল আর কাজী নজরুল ইসলামের ঐতিহ্যবাহী তরুণেরাই তো! নির্বাক নজরুলের সেদিনকার উত্তরসূরী কবি-সাহিত্যিকদের শাহীন স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানের ইয়াজিদী শক্তি। পারেনি। বুকের রক্ত ঢেলে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের এই মাতৃভূমির মায়ের ছেলেরা, 'অন্য কারো' ছেলেরা নয়! মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরাই তো লড়েছি একই ধর্মের পরিচয়ধারী ইয়াজিদের বিরুদ্ধে, অন্যের ছেলেরা তো সেই মাতৃভাষার জন্য একই ধর্মের পরিচয়ধারী কংস রাজার বিরুদ্ধে টু-শব্দটিও করেনি। তাহলে? তাহলে মহল বিশেষের পক্ষ থেকে এই স্পর্ধিত উচ্চারণ কেন যে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের সকল সাহিত্য-কৃতির প্রয়াস ছিল এক কলঙ্কজনক দুঃস্বপ্ন-তাড়িত প্রয়াস? তাহলে কি মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই অনন্য সংগ্রামও সেই কলঙ্কজনক দুঃস্বপ্ন-তাড়িত প্রয়াসেরই অন্তর্ভুক্ত? জানি, ভাষা আন্দোলনের যে রূপরেখা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, মহল বিশেষের নিগূঢ় কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তার প্রথমাংশটুকু বাদ দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের আইন-বিধি সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে পূর্ব-বাংলার অন্যতম সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত দাবী থেকেই যেন ভাষা আন্দোলনের শুরু! তার আগে যেন এই আন্দোলনের কোন সূচনা ছিল না, কোন সংগঠন ছিল না! জানি, ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ঘটনাপঞ্জীতে বিশেষ কোন এক 'চেতনা' প্রক্ষিপ্ত করে তাকে এক চিহ্নিত ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়াস সেই কবে থেকেই চলে আসছে। সে প্রয়াসের প্রয়োজনেই ঘটনাপঞ্জীর প্রথমাংশের সঙ্গে আরও কিছু সত্যকে আড়ালে রাখতে হয়।

হালে অবিশ্যি কোথাও কখনও এই আন্দোলনের সূচনাকারী হিসাবে তমদ্দুন মজলিসের নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে, উচ্চারিত হয়ে থাকে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ মন্তব্যও করা হয় যে, পরে এই আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের কোন ভূমিকা ছিল না। অথচ আজ অনেকেই ভেবে দেখতে চান না যে, তমদ্দুন মজলিস ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। কোন রাজনৈতিক দল নয়। ইসলামের মূলনীতি ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তিশীল পাঁচ শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সাহিত্যের সমাহারপন্থী ধারাকে আত্মস্থ করে আধুনিক দুনিয়ার সাহিত্যাঙ্গনের

www.pathagar.com

উপযোগী বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের পূর্ব-শর্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল নতুন দেশে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজনে সাড়া দিতে গিয়েই অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে আরম্ভ হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের সূচনা ও তাকে সংগঠিত করার কাজ। আমরা ছিলাম অধ্যাপক কাসেমের স্বপ্ন-সাথী, বিভিন্ন সময়ে যোগ দেওয়া তমদ্দুন মজলিসের কর্মী। সূচনাকালে আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ গুছিয়ে আনা হল যখন, যখন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের মত আরও নব-গঠিত সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠন ও দল এগিয়ে এসে আন্দোলনকে সংগ্রামমুখী করার নেতৃত্ব গ্রহণ করল, তখন তমদ্দুন মজলিস কর্মীদের দায়িত্ব হল নিজেদের মেধা ও সাধ্য অনুসারে সেই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। আমরা জানি, সে দায়িত্ব আমরা পালন করেছি। এ বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংগ্রাম পরিষদের গঠন রূপে।

ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী পথ পরিক্রমায় এসেছিল মহান একুশে ফেব্রুয়ারী। একুশের শহীদান আমাদের সকলকে আবদ্ধ করে গেছেন এক দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বন্ধনে। সে প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে আধুনিক দুনিয়ার সাহিত্যাঙ্গনে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি। আমাদের সাহিত্যচর্চায় এই-ই হচ্ছে মহান একুশের তাৎপর্য।

রাষ্ট্রীয়ভাবে সাতচল্লিশে আমরা যখন পাকিস্তানবাসী হলাম, তখনও আমাদের চেতনায় লালিত ছিল মূল লাহোর প্রস্তাবে স্বীকৃত এ জনপদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের কথা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তার প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ করেছিল মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। আর একুশে ফেব্রুয়ারীকে বুকে নিয়েই সেই চেতনার অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। এই চেতনাকে মুখর করে তোলার স্বপ্ন নিয়েই সাতচল্লিশের পহেলা সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করেছিল তমদ্দুন মজলিস। সেই চেতনার চরম উন্মেষ ঘটে বায়ান্ন'র ২১ ফেব্রুয়ারী। আর সেই পথ ধরেই একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ফিরে পেয়েছি আমাদের স্বাধীন সত্তা, পেয়েছি স্বদেশ ভূমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

বায়ান্ন–তেপ্পান্ন–চুয়ান্ন'র দ্যুতি

আমাদের ভাষা আন্দোলনের পথিকৃত অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিসের মাসিক সাহিত্য–পত্র 'দ্যুতি' ১৯৫২ সালের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোর স্বাক্ষর বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। উল্লেখ্য, তমদ্দুন মজলিসের মুখপাত্র আন্দোলন সংগঠনে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে, সাহিত্য ক্ষেত্রে 'দ্যুতি'র ভূমিকা ছিল তারই পরিপূরক। আজ সে কথা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী। সে লক্ষ্যেই এখানে আমরা দু'বছরের 'দ্যুতি'র খতিয়ানমূলক একটি প্রবন্ধ তুলে ধরলাম।

উনিশ শ' বায়ান্ন সালের জানুয়ারী মাস। এগিয়ে আসছে ফেব্রুয়ারী। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে উপনীত। ওই সময়টায় তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে মাসিক সাহিত্যপত্র 'দ্যুতি'। এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন কাজী শামসুজ্জামান। তমদ্দুন মজলিসের তখনকার 'সাহিত্য ও লোককলা সম্পাদক' হিসাবে এই নবপর্যায়ের 'দ্যুতি'র সম্পাদক ছিলাম আমি, আসকার ইবনে শাইখ (অবিশ্যি নবতর ছদ্মনাম 'ওবায়েদ আসকার'–এই নামে)। সহ–সম্পাদক ছিলেন আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, চৌধুরী লুৎফুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। 'নবপর্যায়' প্রসঙ্গে বলতে হয়, তমদ্দুন মজলিশ থেকে 'দ্যুতি' প্রকাশিত হওয়ার আগে অন্যের দ্বারা 'দ্যুতি' কিছুদিন প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তখনও এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন জনাব কাজী শামসুজ্জামানই। নব পর্যায়ের 'দ্যুতি'র প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সহ–সম্পাদনায় কারও নাম ছাপা হত না। সপ্তম সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৫৯ সন) সহ–সম্পাদনায় ছিলেন সর্বজনাব আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, চৌধুরী লুৎফুর রহমান ও মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, এবং ব্যবস্থাপনায় জনাব হাসান ইকবাল। অষ্টম সংখ্যায় সহ–সম্পাদনায় ছিলেন চৌধুরী লুৎফুর রহমান ও মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্। অতঃপর প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে 'দ্যুতি'র সহ–সম্পাদনায় ছিলেন সর্বজনাব চৌধুরী লুৎফুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এবং উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে সব কিছুর পেছনে সদা–কার্যকর ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবুল কাসেম ও তাঁর নীরব সাহায্যকারিনী বেগম রাহেলা কাসেম।

www.pathagar.com

অর্থাভাবে 'দ্যুতি'র প্রকাশ তেমন নিয়মিত ছিল না; প্রথম বর্ষে ১২শ' সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়নি এবং দ্বিতীয় বর্ষের ১২শ' সংখ্যা থেকে দ্যুতির প্রকাশনা তমদ্দুন মজলিসের কাছ থেকে চলে যায় অন্যের দায়িত্বে এবং সে-দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব এ, এইচ, এম, মোহীয়্যুদ-দীন; তিনিই হন 'দ্যুতি'র সম্পাদক। তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আমার কাছে আজও রয়েছে। সেগুলো থেকেই 'দ্যুতি'র লেখক, লেখা এবং অন্যান্য বিষয়ের একটা রূপরেখা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই। এই রূপরেখায় লেখা ও লেখকের নাম ছাড়াও মাঝে মধ্যে আছে সম্পাদকীয়ের বিশেষ বিশেষ অংশ, আছে অন্যান্য বিষয়ের উপর কিছু প্রতিবেদন ও আলোচনা। এসব বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে দিলাম এজন্য যে, তাতে করে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের তখনকার চিন্তা-ভাবনার পরিচয় কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

ওই দুই বছরেরও কিছু বেশি সময়ে যাঁরা যাঁরা 'দ্যুতি'তে লিখেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞতা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। তখন লিখে কেউ সম্মানী পেতেন না, আমরাও কাজ করে কেউ সম্মানীর কল্পনাও করতাম না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে তিনজন সহ-সম্পাদকের কথা। জানি না, শক্তিমান কবি চৌধুরী লুৎফর রহমান সাহেব আজ কোথায় আছেন। ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি 'দ্যুতি'র জন্য যা করেছেন, তাতে তাঁকে কখনও ভুলবার নয়। আর জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ও জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁদের অক্লান্ত উৎসাহ ও পরিশ্রম দিয়ে এবং বিভিন্ন নামে সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ-সম্পাদকীয়-সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি লিখে ও অন্যান্য লেখা সংগ্রহ করে 'দ্যুতি'র প্রতিটি সংখ্যাকে সাজিয়েছেন। বলতে গেলে তাঁরাই ছিলেন 'দ্যুতি' সম্পাদনার প্রধান কর্মী। সর্বোপরি, 'দ্যুতি' প্রকাশনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সর্বজনাব শাহেদ আলী, আবদুল গফুর ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের কর্ম-প্রেরণা ও উৎসাহ-উপদেশ দানের স্মৃতি।

লেখা দিয়ে যাঁরা 'দ্যুতি'কে উজ্জ্বল করেছিলেন, লেখার ক্রম-অনুসারে তাঁরা হলেনঃ সর্বজনাব ফররুখ আহমদ, অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ মোকসুদ আলী, অধ্যাপক আবুল কাসেম, শাহেদ আলী, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুর রশীদ খান, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, চৌধুরী লুৎফুর রহমান, তরীকুল আলম, কবীর উদ্দিন আহমদ, কাজী ফজলুর রহমান, অন্নদা শঙ্কর রায়, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক হাসান জামান, আবদুল হাই মাশরেকী, প্রজেশ কুমার রায়, আজীজুল হক, আবদুল গফুর, বদরুদ্দীন উমর, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, আনোয়ারা বেগম, মোস্তাফা কামাল, আতোয়ার রহমান, মাফুজুল হক, নূরুল আফছার, অধ্যাপক মুনশী রইসউদ্দিন, মাহবুব-উল-আলম, আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ আজিজুল হক, গোলাম আহমদ, মীর আবুল হোসেন, আশরাফ সিদ্দিকী,

www.pathagar.com

আহমদ ফরিদ উদ্দিন, সৈয়দ আতাউর রহিম, এরশাদ হোসেন, বদরুল মুনির, অধ্যাপক মোহাম্মদ আজরফ, আসকার ইবনে শাইখ, আবদুর রহমান, হায়াত দায়রাজ খান পাকিস্তানী, রওশন ইজদানী, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন, ভবেশ মুখোপাধ্যায়, মুযহারুল ইসলাম, এ. এস. এম. আবদুল জলীল, মোজাম্মেল সিদ্দিক, মফিজউদ্দিন আহমদ, রাবেয়া খাতুন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মির্জা আ. মু. আবদুল হাই, মোহাম্মদ মামুন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবদুল গাফফার চৌধুরী, নূরুল আলম, আতাউল হক, মুহম্মদ আবু তালিব, নূরুন নাহার বেগম, হাবীবুর রহমান, শেখ লুৎফুর রহমান, খোন্দকার আবদুর রহীম, আবদুল কুদ্দুছ, আহমদ সিরাজ, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মা-আ-মু, জহরুল আলম, মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্, আবু মোহাম্মদ, হেদায়েতুল ইসলাম খান, শফিকা হুসেন, সোলায়মান খান, মীজানুর রহমান, অনির্বাণ, সৈয়দ আলী আশরাফ, মীর শামসুল হুদা, চৌধুরী ওসমান, মুফাখ্খারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর খালেদ, মিন্নাত আলী, মোহাম্মদ ফারুক, আবদুল হাই সরকার, সেলিম চৌধুরী, মোহাম্মদ রিয়াছত আলী, মোজাফ্ফর আহমদ, নাজমুল হক, কবি শাহাদাৎ হোসেন, আল মাহমুদ, লুতফুল হায়দার চৌধুরী, আহমাদুর রহমান ও মোয়াজ্জম হোসেন।

উপরোক্ত নামগুলোর মধ্যে চার-পাঁচটি নাম ছিল সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদেরই ছদ্মনাম। নিজেদের লেখা ছাড়াও সহ-সম্পাদকবৃন্দ, বিশেষ করে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এভাবেই 'দ্যুতি'কে উপযোগী করে বের করতে সাহায্য করেছেন। ওই ছদ্মনামগুলো বাদ দিলে পঁচাশিরও বেশী খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক 'দ্যুতি'তে লিখেছেন। তখনকার প্রেক্ষিতে সংখ্যাটা মোটেই কম নয়। উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, এতসব কবি-সাহিত্যিক ও আমাদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন না থাকলে একই মাসিক পত্রে নিজেদের মানস ফসলের এই সমারোহ ঘটানো সম্ভব হত না। বলা যায়, 'দ্যুতি'র মাধ্যমে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা মধুর আত্মীয়তার পরিবেশ। সেদিনের এই আত্মীয়তার জন্য আমরা 'দ্যুতি'-কর্মীরা আজও গর্বিত, স্মৃতিসিক্ত। এবং আজও তাঁদের প্রতি ঋণ স্বীকার করতে মন চাইছে না এই আত্মীয়তার জন্যই। শুধু শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবঃ আমাদের স্মৃতির আকাশে তাঁরা সবাই একান্ত আপন হয়েই অস্তিত্ববান।

এবার তুলে ধরা হচ্ছে 'দ্যুতি'র সংখ্যাওয়ারী পরিসংখ্যানী বিবরণ।
নবপর্যায়ে 'দ্যুতি'র প্রথম সংখ্যার সূচনা পৃষ্ঠায়
কালো বর্ডারে পরিবৃত করে লেখা হয়ঃ

www.pathagar.com

সাড়ে চার কোটি মানুষের দাবীকে প্রতিষ্ঠা
করতে যেয়ে যেসব বীর শহীদ বুকের
তপ্ত লোহ ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করে
দিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার সংগ্রামকে
এগিয়ে দিয়ে গেলেন, তাঁদের মহান
সংগ্রামী ইতিহাস আগামী দিনে
চলার পথের দিশারী হোক

দ্যুতি

[মাসিক সাহিত্য পত্র]

১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যাঃ ফাল্গুন, ১৩৫৮; ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
জাগৃত (কবিতা)	ফররুখ আহমদ	–৩
অসূয়া (গল্প)	অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী	৪–১৩
সেতার (গল্প)	সৈয়দ মোকসুদ আলী	১৪–১৮
আধুনিক বিজ্ঞানের গতি (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আবুল কাসেম	১৯–২৫
পাগল (গল্প)	শাহেদ আলী	২৬–৩৩
বুদ্ধিজীবীদের প্রতি (প্রবন্ধ)	আলবার্ট আইন্‌স্টাইন অনুবাদঃ সানাউল্লাহ নূরী	৩৪–৩৮
ভবিষ্যতের কবি–কে (কবিতা)	আবদুর রশীদ খান	৩৯–৪১
জাগৃতি (কবিতা)	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	৪১–৪২
প্রেতের ছায়ারা কাঁপে (কবিতা)	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	৪২
ভেনাস (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফুর রহমান	৪৩–৪৬
কোনো এক নারীর মৃত্যুতে (কবিতা)	তরীকুল আলম	৪৭–৪৮
ফাল্গুনী (কবিতা)	কবীরউদ্দিন আহমদ	৪৮–৫০
কান্না (গল্প)	কাজী ফজলুর রহমান	৫১–৫৪
বিতর্কিকা		
নতুন অধ্যায়	অন্নদাশঙ্কর রায়	৫৫–৫৯
সম্পাদকের দৃষ্টিতে আমাদের রাষ্ট্র ভাষা		৬০–৬১

www.pathagar.com

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকার উর্দূকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত অনুযায়ীই সরকার পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের প্রাদেশিক ভাষা হলেও তারা উর্দূকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দূই যে সরকারী ভাষা হবে এবং উর্দূই যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে তাতে দ্বিধা প্রকাশ করার কিছুই নেই।

ঠিক একই নীতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শতকরা ৫৬ জন বাংলা ভাষাভাষীর মতামতকেও অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা কোন গণতান্ত্রিক সরকারের থাকতে পারে না।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিগত ১৯৪৮ সনে সারা পূর্বপাকিস্তানে প্রবল আন্দোলন হয়ে গেছে। জনমতের চাপে পড়ে তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবীকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারীভাবে সে প্রতিশ্রুতিও প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়নি। শুধু তাই নয়, জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব পাক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পূর্ব-বঙ্গ সফরে এসে উর্দূকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। তার প্রতিবাদ স্বরূপ গোটা প্রদেশেই তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রদেশের ছাত্ররা শোভাযাত্রা, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার দাবী করছেন।

আমরা আশা করি সরকার গণদাবীকে উপেক্ষা করে সমস্যা-প্রপীড়িত পাকিস্তানকে আরো সমস্যা-সংকুল করে তুলবেন না।

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

আগামী মার্চ মাসের ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখে ঢাকায় 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মেলনে সাহিত্য, লোককলা, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন ও মহিলা নামে পাঁচটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনের প্রত্যেকটি অধিবেশনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সভাপতিও মনোনীত করা হয়েছে। সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, পশ্চিম বঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য জায়গার চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীগণ যোগদান করবেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ব্যাপী সম্মেলনের জোর প্রস্তুতি চলছে।

পাকিস্তানের চার বছরের ইতিহাসে এ ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। সম্মেলনের প্রচারপত্র থেকে যতদূর জানা যায়, বর্তমান দুনিয়ার আদর্শিক দ্বন্দ্বের মধ্যখানে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে ইসলামের জীবন-পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থার যুগোপযোগী কার্যকরী রূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে ইসলামপন্থীদের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হওয়াও অপরিহার্য। এই দ্বিবিধ মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদেই তমদ্দুন মজলিসের কর্মকর্তারা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত শুভ ও প্রশংসনীয়।

বর্তমান দুনিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে চিন্তার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মনীষীদের চিন্তারাজ্য থেকে মানব-জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিভংগি নির্বাসিত হয়েছে। ফলে সারা দুনিয়ায় মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে হানাহানি রক্তারক্তি ও বিশৃঙ্খলাই স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। এ বিপর্যয় অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে বলিষ্ঠ ও বৃহত্তর জীবনাদর্শের প্রয়োজন। এ সম্মেলন এমনি সামগ্রিক ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের সন্ধান দেবে। এ জন্যেই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ছাত্র-যুবক ও সমাজকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন দাবী করেন।

সংস্কৃতিক আন্দোলন অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এই সম্মেলন পাকিস্তানে একটা সুস্থ ও সবল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেবে বলেই আমরা বাসনা রাখি।

বিতর্কিকা

নতুন অধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায়

দ্যুতির "বিতর্কিকা" শীর্ষক ফোরামে বিভিন্ন মতের আলোচনা-সমালোচনা পত্রস্থ করা হবে। সেই অনুসারে এবার শ্রীযুক্ত অন্নদা শংকর রায়ের "নতুন অধ্যায়" প্রকাশ করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, আমরা এ নিবন্ধে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যের সহিত একমত নই। আমরা বিশ্বাস করি, এতে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যই ইসলাম ও মুসলিম-মন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত। শ্রীযুক্ত রায় কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ মারফৎ 'দ্যুতি'তে শীঘ্রই বিস্তারিত আলোচনা শুরু হবে। -সঃ দ্যুঃ

পনেরো বছর আগে 'ভারতীয় মুসলমান' নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলুম। তার শেষ ভাগে ছিল-

"মুসলমানের কাছে তার সংহতি তার দেশের চেয়ে বড়। সব দেশের সব মুসলমান এক সূত্রে গ্রথিত, দেশ সে সূত্রের ছেদ নয়। সেইজন্যেএকজন মুসলমান নেতা বলেছিলেন, ন্যাশনালিষ্ট ও মুসলিম দু'টি স্বতোবিরুদ্ধ শব্দ। রোমান ক্যাথলিক চার্চেরও ঠিক এমনি সংহতির আদর্শ। সে আদর্শ প্রতি দেশের প্রতি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে পোপের এক একটি ডিপার্টমেন্ট ও প্রতি রোমান ক্যাথলিককে পোপের প্রজা বানিয়েছে। এত বানানো সত্ত্বেও তাদের বৈদেশিক বানাতে পারেনি। সকলের ল্যাটিন

www.pathagar.com

নামকরণপূর্বক সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, ল্যাটিনেই উপাসনা চলত ও তাতে আপত্তি থেকেই প্রোটেস্টান্ট মতবাদ। প্রোটেস্টান্টদের উত্থান প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনালিজমের উত্থান। এখন ক্যাথলিকরাও সমান ন্যাশনালিষ্ট। মুসলমানদের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটবার হেতু নেই। তা' যে নেই তার প্রমাণ দিয়েছেন কামাল ও রিজাশাহ্। আমরা অপেক্ষা করব।"

দশ বছর আগে লিখি আর একটি প্রবন্ধ। নাম "আদিম পাপ"। তার এক জায়গায় ছিল–

"বরাবরই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দুটি চিন্তাধারা পাশাপাশি বয়ে আসছে। একটি আরবাভিমুখ, অপরটি ভারতাভিমুখ। আজকের দিনে একটির নাম পাকিস্তান, অপরটির নাম নিখিল ভারত। হঠাৎ ইংরাজ বিদায় নিলে যে এ দু'টি চিন্তাধারা অভিন্ন হয়ে ভারতাভিমুখ হবে, এ ভরসা আমারনেই। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি মুসলমানের দোটানা কোনদিনই ঘুচবে না। আরব ও ভারত তাকে ডানহাত ও বাম হাত ধরে টানতেই থাকবে চিরটা কাল। আরবাভিমুখ মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়, বোধ হয় বেশীই। সংখ্যা কম হলেও প্রতিপত্তি যে বেশী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সে প্রতিপত্তি যে কেবল তৃতীয় পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে তা' নয়। সে প্রতিপত্তি নির্ভর করে ইসলামের কেন্দ্র মক্কার উপর, নামকরণের ও প্রার্থনার ভাষা আরবীর উপর, খেলাফৎ নামক সার্বভৌম আইডিয়ার উপর।"

সেই বছরই "জন্মস্বত্ব" নামে আর একটি প্রবন্ধ লিখি। তাতে ছিল–

"আজকের দিনে যারা নেশনের মেলায় নেশন নয় তাদের দাবী কেউ কানে তোলে না। এটা বুঝতে পেরে আমাদের মুসলমান নেতারা তাঁদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ত্যাগ করে নৈশনিক পরিচয় গ্রহণ করছেন। ছিলেন মুসলিম, হতে চান পাকিস্তানী। একদিক থেকে এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কেননা মুসলমানের মন ন্যাশনালিজমে সাড়া দেয় না সহজে। পাকিস্তানের খিড়কি দিয়ে এই যে ন্যাশনালিজম ঢুকল এর ধাক্কায় একদিন সাম্প্রদায়িকতা হটে যাবে। এই রকমই হয়েছে মিশরে, তুর্কীতে, ইরাণে, আফগানিস্তানে। পাকিস্তান মুসলমানকে ন্যাশনালিষ্ট করবে। তাতে অবশ্য ভারতের অঙ্গচ্ছেদ। ভারতীয় বলে যারা পরিচয় দেয় তারা বিনা দ্বন্দ্বে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়বে না। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই যে ন্যাশনালিজমের কুইনিন খাওয়াতে গেলে পাকিস্তানের চিনি দরকার। আর ন্যাশনালিজমের চিনি না খেলে সাম্প্রদায়িকতার জ্বর সারবে না।"

এসব কথা লিখবার পর দশ বছর কেটে গেছে। কোন পক্ষই বিনা দ্বন্দ্বে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়েনি। এখনো কাশ্মীরের ভূস্বত্ব নিয়ে বিবাদ চলছে। কেউ বলতে পারে না কবে এর নিষ্পত্তি হবে। এর দরুন যুদ্ধ বাধবে কি না বিধাতা জানেন। তবে একটা কথা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে। এই উপমহাদেশের দুই বিচ্ছিন্ন খন্ডে দুটি স্বতন্ত্র নেশন গড়ে উঠছে। দুই অংশেই ন্যাশনালিজমের জয়জয়কার। যে রাষ্ট্রের নাম ইন্ডিয়া

www.pathagar.com

তথা ভারত সে রাষ্ট্র ন্যাশনালিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্রিশ বছর ধরে ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম করা হয়েছে ন্যাশনাল কংগ্রেসের পতাকাতলে। ষাট বছর ধরে সংঘবদ্ধ হয়েছে ন্যাশনাল কংগ্রেস। প্রথম দিন থেকেই কংগ্রেসের নেতার আসনে বসেছেন মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান। সুতরাং এই রাষ্ট্রের মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষ নেশনবাদ। এই রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্র নয়। হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে এই রাষ্ট্রের আদর্শ মেলে না বলেই হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। এদের প্রভাব এখনো সম্পূর্ণ দূর হয়নি। কিন্তু এবারকার নির্বাচনে এদের পরাজয় ঘটেছে। সুতরাং এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে ভারত রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা পরাস্ত হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা জয়ী হচ্ছে।

কিন্তু পাকিস্তানেও কি তাই হচ্ছে? হাঁ, পাকিস্তানেও তাই হতে যাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে যাঁরা আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে যোগ দিচ্ছেন, যাঁরা রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, যাঁরা বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ-বিদেশ ঘুরছেন, তাঁরা পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন পাকিস্তানী ন্যাশনাল বলে। ইরানে, ইরাকে, তুর্কীতে, মিশরে, তাঁরা মুসলমান বলে পরিচয় দিলে কেউ তাঁদের দিকে ফিরে তাকাবে না, কারণ কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে তাঁরা এমন কিছু বিশিষ্ট নন। কিন্তু যেই তাঁরা পরিচয় দেন যে তাঁরা পাকিস্তানী অমনি তাঁরা বিশিষ্ট আসন পান। তাঁদের মর্যাদা তাঁদের নেশনের মর্যাদার উপর নির্ভর, তাঁদের ধর্মের মর্যাদার উপর নয়। তাই যদি হলো তবে প্যান ইসলামের তাৎপর্য রইল কোথায়! প্যানইসলাম থেকেই পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু পাকিস্তান দিনে দিনে সাবালক হয়ে উঠছে, জননীর কোলে চিরকাল সে থাকবে না, থাকতে পারে না।

ভারতীয় মুসলমানের দোটানা এই ভাবেই মিটল। অখন্ড মুসলমান সমাজ দু'ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ ভারতীয় মহাসমাজের অঙ্গ। আরেক ভাগ পাকস্তানী মহাসমাজের অঙ্গ। মহাসমাজ হচ্ছে বহু সমাজের সমষ্টি। একটি মাত্র সমাজের সংকীর্ণ দূর্গ নয়। পাকিস্তান তার জাতীয় পতাকায় অমুসলমানদের জন্যে স্থান রেখেছে। অমুসলমানরাও পাকিস্তানী ন্যাশনাল। কেন যে তাঁদের "জিম্মী" বলা হচ্ছে তার অর্থ আমার কাছে দুর্বোধ্য। প্রত্যেক দেশেই কত লোক আছে যাদের সংখ্যা বেশী নয়, যারা মাইনরিটি। ইংলন্ডের ক্যাথলিকরা সংখ্যায় কম, ফ্রান্সের প্রোটেষ্ট্যান্টরা সংখ্যায় কম। তা বলে কি কেউ তাদের বলে "জিম্মী"? ভারতের খৃষ্টান, পার্শী, শিখদের যদি "জিম্মী" বা সেই রকম কোনো একটা শব্দে অভিহিত করা হয় তা হলে কি তাঁরা আপত্তি করবেন না? ভারতের মুসলমানরা যে আপত্তি করবেন এ বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? মাইনরিটি হলেই যদি মানুষ "জিম্মী" হয় তা হলে দেশের বনিয়াদে ফাটল ধরে, দেশ কোনো দিন দৃঢ় হয় না। সিরিয়াতে, মিশরে চিরকাল বহু খ্রীষ্টানের বাস। যখন মুসলমান ছিল না তখনো খ্রীষ্টান ছিল। এরা সেই খ্রীষ্টানের বংশধর। কেউ কি তা বলে এদের "জিম্মী" মনে করে? পাকিস্তানে যেদিন মুসলমান ছিল না সেদিন হিন্দু ছিল। আজ তাদের দেশ পাকিস্তান হয়েছে বলে কি তারা "জিম্মী" হবে?

www.pathagar.com

আর একটু তলিয়ে ভাবা যাক। রাষ্ট্র চলে সর্বসাধারণের ট্যাক্‌সে। কোনো একটি সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কোনো বিশেষ দায়িত্ব নেই। পুলিশ রক্ষা করতে বাধ্য প্রত্যেকটি করদাতাকে। ম্যাজিস্ট্রেট অভয় দিতে বাধ্য প্রত্যেকটি অধিবাসীকে। তাই যদি হয় তবে একদল মানুষ আরেক দল মানুষের "জিম্মী" হতে যাবে কোন দুঃখে! রাষ্ট্রই বা কেন মাইনরিটিকে জিম্মায় রাখবে, মেজরিটিকে জিম্মায় রাখবে না? আমার মনে হয় এসব পুরাতন শব্দ অভিধানের পৃষ্ঠা থেকে আহরন করে ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন অধ্যায়ের মর্ম না বুঝে। এ যুগে কেউ কারো "জিম্মী" নয়। প্রত্যেকের ট্যাক্‌সে রাজ্য চলে, প্রত্যেকেরই প্রাপ্য যা কিছু অপরের প্রাপ্য। ইংলন্ডে আজকাল নিষ্কর্মা বলে কেউ নেই। যার কাজ নেই রাষ্ট্র তাকে কাজ জোগায়। আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল খুন জখম থেকে বাঁচানো নয়, খাইয়ে পরিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে কাজ জুগিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখা। তেমনি আধুনিক নাগরিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রের জন্যে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত থাকা। "জিম্মী"র কাছ থেকে এত বড় ত্যাগ কেউ প্রত্যাশা করে কি? "জিম্মী"র জন্যেই বা কোন রাষ্ট্র কবে এসব করেছে?

পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা এই "জিম্মী" সমস্যা। মাইনরিটিকে "জিম্মী" করে রাখলে কনষ্টিটিউশনে সমান অধিকার দেয়া বৃথা। সমান অধিকার না দিলে বা এক হাতে দিয়ে আরেক হাতে কেড়ে নিলে এ যুগের মাইনরিটি চুপ করে থাকবে না, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জগতের জনমত মাইনরিটি সমস্যার এ জাতীয় সমাধান আদৌ সমর্থন করবে না। পাকিস্তানে যেসব হিন্দু স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছেন, যাঁরা মোগলের কাছে মান সম্মান পেয়েছেন, যাঁরা ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন তাঁরা যদি সেখানে ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট হিসাবে থাকতে চান তা হলে তাঁদের সমস্যা কেউ মেটাতে পারবে না। কিন্তু তাঁরা যদি সেখানে পাকিস্তানী ন্যাশনালিষ্টরূপে নিজেদের স্থান করে নিতে রাজী হন তা হলে বিশ্ব তাঁদের সহায়। ইতিহাস তাঁদের সহায়। পাকিস্তানেরই চিন্তাশীল মুসলমান তাঁদের সহায়। একদিন পাকিস্তানের কনষ্টিটিউশনও তাঁদের সহায় হবে। "জিম্মী" হয়ে থাকতে হবে না তাঁদের।

ন্যাশনালিজম মুসলমানের মনে সহজে ঢোকে না। সেইজন্যে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান হওয়ার ফলে চার কোটি মুসলমান এক দিনেই ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন। নয়তো এঁদের ভারতীয় ন্যাশলিষ্ট করে তুলতে আমাদের দশ বিশ বছর লাগত। বাকী ছয় কোটি মুসলমান হয়েছেন পাকিস্তানী ন্যাশনালিষ্ট। এটাও ইসলামের ইতিহাসে যুগ পরিবর্তনের সূচনা। এই অনুরূপ ঘটনার জন্যে যেতে হয় ইউরোপের ইতিহাসে, যেদিন প্রোটেষ্টান্ট রিফরমেশন শুরু হয়। এত বড় একটা ব্যাপারের জন্যে কিছু দাম না দিলে কি চলে? দেশ বিভাগ হচ্ছে সেই দাম। এর জন্যে আমাদের মনে ক্ষোভ আছে, এ ব্যথা আমরা এ জীবনে ভুলব না। কিন্তু ব্যথা কি মুসলমানেরা কম পেলেন? এই যে তাঁদের অখন্ড সমাজ দ্বিখন্ড হয়ে গেল এ ব্যথা পাকিস্তানী

www.pathagar.com

মুসলমানদের মনে লাগছে না, কিন্তু এখানকার মুসলমানদের মনে লাগছে বৈকি! আমরা স্বভাবত অসংহত। কিন্তু তাঁরা স্বভাবত সুসংহত। তাঁদের সংহতি ভেঙ্গে গেল তাঁদেরই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে। অনুশোচনার জন্যে তখন সময় পাননি। এবার তার সময় আসবে।

তবে পাকিস্তান হচ্ছে সেট্‌ল্‌ড্ ফ্যাক্‌ট্। তাকে আন্‌সেটেল্‌ড্ করা চলবে না। এক বার আমরা সেট্‌ল্‌ড্ ফ্যাক্টকে আনসেটল করতে গিয়ে বোকা বনে গেছি। আরেক বার সে ভুল করব না। ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস দুই ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছে। এটা আমাদের মালুম ছিল না। ইসলামের ইতিহাসকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। তা যদি করি তা হলে দেখব পাকিস্তানের মাটিতে একদিন কামাল পাশার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর তলোয়ারের খোঁচায় এমন সব সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে যা আমাদের সাহসে কুলোতে না। বহু বিবাহ রদ হয়েছে, এক বিবাহ কায়েম হয়েছে, বোরখার বালাই নেই, আরবীতে নামাজ পড়া হয় না, কোরান পড়া হয় বাংলায়, মোল্লারা শোলার হ্যাট পরে, ফেজ মাথায় দিলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, পীর সাহেবরা নিরুদ্দেশ। "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে।"

১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা–চৈত্র–বৈশাখঃ ১৩৫৮

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)	ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন	৬৬–৭১
ধর্ম–নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	৭২–৮১
আন্‌ধার মানিকের রাজকন্যা (ছোট উপন্যাস)	সানাউল্লাহ নূরী	৮৪–১২১
কান্দে কন্যা (কবিতা)	আবদুল হাই মাশরেকী	১২২–১২৩
হে কলম (কবিতা)	প্রজেশ কুমার রায়	১২৪–১২৫
পথহারা পাখী (কবিতা)	আজীজুল হক	১২৫–১২৬
বিতর্কিকা		
'নতুন অধ্যায়'–প্রসংগ	আবদুল গফুর	১২৭–১২১

সম্পাদকের দৃষ্টিতে

নববর্ষ

ফাল্গুনের নব কিশলয়, আমের মুকুল আমাদের চোখে আনে স্বপ্ন, মনে আনে সম্ভাবনা। সেই স্বপ্ন, সম্ভাবনা চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে পথ হারায় যেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে যেন একটা বাধা....কালের রথচক্র কিন্তু থামে না।

www.pathagar.com

বৈশাখ

প্রকৃতির নবরূপ। এ রূপ সংগ্রামের, পথের বাধাকে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে জীবন-পথে এগিয়ে যাবার। কাল-বৈশাখী শুধুই ধ্বংসের দানবশক্তির প্রকাশ নয়, যৌবনের প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাসও। পুরাতনের জীর্ণ নিরাশার উপর দিয়ে এ শক্তির জয়যাত্রা। ভবিষ্যৎকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সুমহান ব্রত নিয়ে এ যৌবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম করে। ভীরু নীচতার প্রশ্রয় দেয় না, দিতে জানে না। এ বৈশাখ শুধু মহাকালের একটা অংশই নয়, তার পরিচয় শুধু দিন আর মাসেই শেষ নয়। বাংলাদেশের প্রকৃতির যে স্বভাব, যে ধর্মকে দিন ও মাস নির্দেশিত করেছে- সেই ধর্মকে, সেই বিশেষ প্রকৃতিকে আমরা উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাই। শ্রদ্ধা জানাই তার সুমহান ব্রতকে। অভিনন্দন জানাই এই শক্তিসংহত বাংলার যৌবনকে। তার জয়যাত্রা সফল হোক, সার্থক হোক।

প্রকৃতির শিক্ষা আমরা ভুলব না। পুরাতন আমাদের অভিজ্ঞতা দিক, ভুল-নির্দেশ করে দিক ভবিষ্যতের পৃথিবী গড়ে তোলায় বর্তমানের কর্মপ্রেরণা। যে বর্ষ গেল, তার জন্য দুঃখ নেই, যে বর্ষ এসেছে তা যেন হয় আরও সুন্দর, আরও মাধুর্যময়। শ্রদ্ধাভরে বাংলার বৈশাখ তথা নববর্ষকে স্বাগত জানাই।

রাষ্ট্রভাষার দাবী

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এতগুলো ছাত্র ও নিরীহ জনসাধারণের রক্তদানের পরও জাতীয় পার্লামেন্ট এ প্রশ্ন সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না কেন, আমাদের কাছে তা এক মহা দুর্বোধ্য ব্যাপার। বলা হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এ ব্যাপারে একমত থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এখনো এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি যে, উর্দুর সংগে বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের কথা হলো, রাষ্ট্রের সাড়ে চার কোটি সংখ্যাগুরু জনসাধারণ যে এ দাবী উত্থাপন করেছে, তাই-ই কি এ দাবীর যৌক্তিকতার যথেষ্ট প্রমাণ নয়? কিন্তু আসলে কি ব্যাপার তাই? পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণও যে ক্রমেই এ দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিচ্ছেন তা কি একটি বাস্তব সত্য নয়? আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ ও জাতীয় ঐক্যকে পেছনে ঠেলে দিয়ে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক অহমিকাকে যারা একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা ছাড়া আর সব মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী বাংলাকে সমর্থন করবেন। কিন্তু আমরা মনে করি-এ দাবী রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু অংশের, এ দাবীর যৌক্তিকতার এই বড় প্রমাণ। সংখ্যাগুরুর দাবী ততক্ষণ পর্যন্ত লংঘন করে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা সংখ্যালঘুর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে আঘাত না হানে। বাংলার সাথে উর্দুর স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীরা সেদিক দিয়েও নিজেদের বিচক্ষণ সংখ্যাগুরু বলে প্রমাণ করেছেন।

www.pathagar.com

সমঝোতার প্রয়োজন

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজকাল অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। সরকারের এ ব্যাপারে যে বিরাট কর্তব্য ছিল তা খুব সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। সকলেই জানেন, সাময়িক পত্র-পত্রিকা ভাবের আদান-প্রদানের অর্থাৎ সমঝোতার সেতু নির্মাণের অন্যতম প্রধান উপায়। কিন্তু পূর্বেকার এক পয়সার স্থলে সরকার বর্তমানে আট পয়সার ডাক টিকেট ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের সমঝোতার এ সম্ভাবনাকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। আমরা সরকারের এ আত্মধ্বংসী নীতির যৌক্তিকতা বুঝতে সত্যিই অক্ষম। সমঝোতার কথা উঠাতে আরেকটি প্রশ্নও আমাদের মনে জাগছে। সমঝোতা তো হবে, কিসের ভিত্তিতে? অর্থাৎ কোন্ পথে সত্যিকার সমঝোতা সম্ভব? শুধু উর্দূ ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করে নিলেই অথবা কিছুদিন পরপর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে 'শুভেচ্ছা মিশন' পাঠালেই কি এ সম্ভব? তা নয়। সমঝোতা আসতে পারে শুধু একটি পথে। সে হলোঃ উভয় অংশের জনসাধারণের জীবন বোধের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। আমাদের উভয়েরই জীবনাদর্শ, চরম লক্ষ্য যে এক, আমরা যে একই জীবন-কামনায় লড়ছি, মরছি, বাঁচছি-এ কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া আজকের দিনে বড় কথা। পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আমরা এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত টানতে পারি। সেদিন পাঞ্জাবী-বাংগালী-সিন্ধী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে পেরেছে। তার কারণ সেদিন সামনে আদর্শ ও লক্ষ্যের ঐক্য ছিলঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। সেদিন যা সম্ভব হয়েছে আজ তা অসম্ভব মনে করবার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন শুধু প্রকৃত পথে অগ্রসর হওয়া। আর সকলেই জানেন, সে পথ হলো শোষণহীন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় অংশের জনসাধারণের জীবনাদর্শের ঐক্য প্রতিষ্ঠা, জীবন-কামনার ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা-জ্যৈষ্ঠঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন উমর	১৩৩-১৩৪
ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	১৪৪-১৪৯
ইকবালের কবিতা (অনুবাদ)	ফররুখ আহমদ	১৫০-১৫৩
জাহাঙ্গীরনগরী (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফুর রহমান	১৫৩-১৫৫
কোনো বিনিদ্রিতার প্রতি (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	১৫৫-১৫৬
নোঙর (কবিতা)	আনোয়ারা বেগম	১৫৭-১৫৮

www.pathagar.com

ইকবাল–কাব্যে কাব্য–সৌন্দর্য (প্রবন্ধ)	মোস্তাফা কামাল	১৫৯–১৬৩
চাবুক (গল্প)	সৈয়দ মোকসুদ আলী	১৬৪–১৬৭
নুন খাই যার (গল্প)	আতোয়ার রহমান	১৬৮–১৭৮
রবীন্দ্রনাথ ও মানুষ (প্রবন্ধ)	মাহফুজুল হক	১৭৯–১৮৪
বিতর্কিকা		
নতুন অধ্যায়	নূরুল আফসার	১৮৫–১৮৭
মহাকবি ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ		
তোমাদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানাই		১৮৮
নয়া জামাত (গান)	গীতিকারঃ ফররুখ আহমদ সুরঃ শেখ লুৎফুর রহমান স্বরলিপিকারঃ অধ্যাপক এম, রইসউদ্দিন	১৮৯–১৯১

১ম বর্ষঃ৪র্থ সংখ্যা–ঈদ সংখ্যা, আষাঢ়ঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
নজরুল জয়ন্তী (প্রবন্ধ)	মাহবুব–উল–আলম	১৯৩–১৯৪
স্তব্ধ আগ্‌নেয়গিরিকে (কবিতা)	আজীজুল হক	১৯৫
সদরঘাট (কবিতা)	আজিজুর রহমান	১৯৬–১৯৭
আমার পৃথিবী জাগে (কবিতা)	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন	১৯৮–১৯৯
যাত্রা শুরু (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফুর রহমান	১৯৯–২০০
	মূলঃ মোপাসাঁ	
প্রতিকৃতি (গল্প)	অনুবাদঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক	২০১–২০৫
ঝরা ধানের কান্না (গল্প)	গোলাম আহমদ	২০৬–২১৫
ধর্ম–নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	২১৬–২২৪
বিতর্কিকা		
'নতুন অধ্যায়' প্রসঙ্গ	মীর আবুল হোসেন	২২৫–২২৬
নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী	২২৭–২৩৩
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		

ঈদ

বছর ঘুরে আবার ঈদ আসছে– ইদুল ফিতর। ঈদ খুশীর পর্ব। কিন্তু এ খুশী জীবনের বল্গাহীন বিলাস–কামনা নয়–এ খুশী ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের জাগ্রত দায়িত্ববোধেরই

www.pathagar.com

মূর্ত প্রকাশ। আজকের এই ঘৃণেধরা, বঞ্চনাসর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে তাই বারবার প্রশ্ন জাগছেঃ ঈদ আমাদের কতটুকু সার্থক হলো? ঈদ যে আমাদের সার্থক হয়নি তার প্রমাণঃ ঈদ হলো ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজ পরিবেশের মূর্ত প্রতীক, আর আমাদের সমাজে সে পরিবেশের একান্তই অভাব। তাই আজকের ঈদ আমাদের খুশীর বাণী বয়ে আনেনি– এনেছে অনাগত এক খুশীর দিনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের বাণী। ঈদের এ বাণী সার্থক হোক।

নজরুল ও সরকার

সারা পাকিস্তানে এবং পশ্চিম বাংলায় নজরুলের 'জন্মদিবস' প্রতিপালিত হয়ে গেলো। বিভিন্ন বেসরকারী প্রচেষ্টার সংগে সংগে সরকারের মন্ত্রী প্রভৃতিও অনেক স্থানে নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু তিলে তিলে মৃত্যুপথযাত্রী কবির রোগমুক্তির দায়িত্ব যাঁরা বেমালুম ভুলে গেছেন, ঘটা করে তাঁদের কবির জন্মোৎসব পালনের সত্যি কি সার্থকতা আছে– আমরা বুঝতে অক্ষম। প্রকাশ, পূর্ব–পাকসরকার কবিকে পূর্বে যে ভাতা দিতেন তা সম্প্রতি বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা সত্য হলে আমাদের পক্ষে চরম লজ্জার কথা। তমদ্দুন মজলিস ও পরিচয় পরিষদের পক্ষ হতে কিছুদিন পূর্বে এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করে কবির আশু সুচিকিৎসার দাবী জানিয়েছিলেন। প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে 'আশু বিবেচনার' প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা আমরা জানি না।

দুঃস্থ কবি–সাহিত্যিকদের প্রতি স্বাধীন সরকারের দায়িত্ব অত্যধিক। নজরুল তো বটেই–তাছাড়া মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রমুখ অন্যান্য দুঃস্থ সাহিত্যিকবৃন্দ পূর্ব–পাকিস্তানের সংস্কৃতি নির্মাণে যাঁদের দান মোটেই কম নয়– সরকার তাঁদেরও উপযুক্ত সাহায্যের বন্দোবস্ত করবেন, এই–ই আমরা আশা করি।

সমালোচনা সাহিত্য

আধুনিক শিক্ষক	আশরাফ সিদ্দিকী	২৩৫

(রচনাঃ আবদুল হাকিক এম, এ, (ক্যান্টাব)

১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা–শ্রাবণঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
আধুনিক মন (প্রবন্ধ)	আহমদ ফরিদউদ্দীন	২৩৭–২৪৪
তৌহিদবাদ ঃ বাংলা কাব্য ও নজরুল (প্রবন্ধ)	আতোয়ার রহমান	২৪৫–২৪৯
ধর্ম–নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	২৫০–২৫৭

www.pathagar.com

বিতর্কিকা

নতুন অধ্যায়	সম্পাদক কর্তৃক	
	আলোচনার সমাপ্তি	২৫৮–২৬২
আতংক (গল্প)	সৈয়দ আতাউর রহিম	২৬৩–২৭১
ত্রিকাল (খুব ছোট গল্প)	এরশাদ হোসেন	২৭২
সবচেয়ে বড়ো কথা (কবিতা)	আবদুর রশীদ খান	২৭৩–২৭৪
কথা (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	২৭৫–২৭৬

সমালোচনা সাহিত্য

নক্ষত্রঃ মানুষঃ মন (আবদুর রশিদ খানের কবিতা সংকলন)	বদরুল মুনির	২৭৭
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		২৭৮

সাহিত্য আলোচনার ভূমিকা

সাহিত্য ব্যক্তি, সমাজদেহ ও সমাজমনের ইতিহাস। সাহিত্য পারে সমাজের নতুন মন গড়ে তুলতে, নতুন ভবিষ্যতের দ্বারোদঘাটন করতে। সমাজের দেহও তাতে বদলায়।

সত্য ও সুন্দরের সাধনাই সাহিত্যের সাধনা। বাস্তব সমাজকে জেনে, তার ভুলত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাহিত্যিক সত্য ও সুন্দরের স্বপ্ন দেখে; সমাজকে তা জানিয়ে সত্য–সুন্দরের স্বপ্ন দেখায়।

কোন দেশের বাস্তব চিত্র যদি সে দেশের সাহিত্য না ফোটে, যদি সেসব চিত্র হয় অনভিজ্ঞ কল্পনাশ্রিত, তাহলে সে সব চিত্র–চরিত্র মানুষের মন ছোঁয় না, সাহিত্যিকেরও মন ছোঁয় না। কারণ মিথ্যার উপর ভিত্তি করেই সেগুলো রচিত যার জন্য মানুষের কোন দরদ নেই। তার শুভাশুভের কোন বালাইও তাদের থাকতে পারে না। তাই কাল্পনিক সাহিত্য মরে যেতে বাধ্য।

সাহিত্যের জন্য এই যে বাস্তবতা, যার ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে মানুষের কান্নাহাসির ইতিহাস, তাকে বস্তুর মত ধরা–ছোঁয়া যায় না, তাকে উপলব্ধি করা যায়, বোঝা যায়। এই জন্য চাই গভীর ও খাঁটি অন্তর্দৃষ্টি। এই অন্তর্দৃষ্টি যার যত গভীর ও সত্য, তিনিই তত বড় সমাজহিতৈষী সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যকে মানুষ আপন করে নেবে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের কান্নাহাসির সংগে তারাও কাঁদবে, হাসবে, বুঝতে পারবে কোথায় তারা রয়েছে, কি অবস্থায়, কোন ব্যবস্থায়। আর তখনই তারা প্রয়োজনে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান করবে। সাহিত্যিকই তাদের দেবেন সে সন্ধান। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নতুনের ইংগিত–মধুর সাহিত্য মানুষের চোখে আনবে স্বপ্ন, মনে দেবে অদম্য আকাংক্ষা। মিলিত পদক্ষেপে দেশবাসী এগিয়ে যাবে। পাকিস্তান অর্জনের পর সমাজের

www.pathagar.com

সকল দিকে পরিবর্তন এসেছে-তা যে রকম পরিবর্তনই হোক। পাকিস্তানের সাহিত্যিক দেশবাসীর কান্নাহাসির ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। সে সাহিত্য, সে ইতিহাস কতটুকু সত্য, কতটুকু বাস্তব,কতটুকু সার্থক, তা জানবার সময় এসেছে। দেশের সুধীবৃন্দ এ সম্বন্ধে অবহিত হোন, তাঁরা বুঝে দেখুন বর্তমান সাহিত্যের গতিধারা কোনদিকে, তাঁদের শুভাশুভ তাঁরা স্থির করুন। 'দ্যুতি'তে আমরা এ আলোচনারই ব্যবস্থা করছি। কিন্তু এর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন খাঁটি নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতা, সুষ্ঠু সমালোচনা। এ আলোচনায় সকল পথের, সকল মতের দরদী ভাই-বোনদের সমান অধিকার।

নতুন অধ্যায়

['নতুন অধ্যায়' শীর্ষক বিতর্কিকা শ্রদ্ধেয় অন্নদা শংকর রায় দ্যুতির প্রথম সংখ্যায় আরম্ভ করিয়াছিলেন- তাহা লইয়া গত তিন সংখ্যায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই সংখ্যায় ইহার সমাপ্তি হইল। আমরা নিম্নে ইহার পর্যালোচনা পত্রস্থ করিলাম।

আগামী সংখ্যা হইতে নতুন বিতর্কিকা আরম্ভ হইবে। বিষয় নির্ধারিত হইয়াছে- "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপ"। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে নানা জনের নানামত ব্যক্ত হইতেছে। একদল বলিতেছেন-ইহা 'শ্রেষ্ঠ রূপ' গ্রহণ করিয়াছে, ইহার পূর্বে যাহা ছিল তাহা প্রায়ই বাজে। আবার অন্যদল বলিতেছেন-সাহিত্যকে যখন-তখন প্রচারের বাহন করিয়া ইহাকে অতি নিম্নস্তরে আনা হইয়াছে। গল্পে ও কবিতার বস্তুবাদী প্রচার-ধর্মীভাব এই গুলিকে দুর্বোধ্য অপাঠ্য ও অত্যন্ত অস্থায়ী করিয়া তুলিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের সুচিন্তিত অভিমত আহ্বান করিতেছি। -সম্পাদক]

অন্নদা বাবুর লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল-পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলমানেরা ক্রমশ জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিবেন। তিনি তাঁর আলোচনায় তুরস্ক প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রসংগত তিনি পাকিস্তানের 'জিম্মী' সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন- এবং উহাকে 'পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তাঁহার প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন "পাকিস্তান হচ্ছে সেট্‌লড্ ফ্যাক্ট, তাকে আনসেট্‌লড্ করা চলবে না"।

"ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছে। এটা আমাদের মালুম ছিল না। ইসলামের ইতিহাসকে তার যথারোগ্য মর্যাদা দিতে হবে।"

\+ + + +

জনাব আবদুল গফুর সাহেব অন্নদা বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন-ভৌগোলিক সীমাকে কেন্দ্র করিয়া যে জাতীয়তাবাদ তাহা মানব সমাজকে সংকীর্ণতা শিক্ষা দিয়াছে। ফল হইয়াছে এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণ

www.pathagar.com

ও শোষণ। তাঁহার মতে একটি মহান আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজের একত্র হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট ও ভারতের কমিউনিষ্টদের মধ্যে যে আদর্শগত ঐক্যবোধ রহিয়াছে তাহাই ভৌগোলিক জাতীয়তার মূলে কুঠার হানিয়াছে।

তিনি আরো বলিয়াছেন–প্রকৃত ধর্ম সে ইসলাম হউক আর হিন্দু ধর্মই হউক তাহা তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা–বিরোধী। ভারতের সাম্প্রদায়িকতাকে একজন প্রকৃত হিন্দু–নেতা গান্ধিজীই বাধা দিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন।

তৃতীয় আলোচনাকারী জনাব নুরুল আফছার সাহেব গফুর সাহেবের বক্তব্যের সমালোচনায় বলিয়াছেন–বিশ্বাসের উপর জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে না, সাধারণ স্বার্থবোধের দ্বারাই তাহা সম্ভব। তিনি বলেন–"সহজ কথায় ইন্দোনেশীয়রা ইন্দোনেশিয়ার মসজিদে বসে, মিশরীয়রা মিশরে বসে, পাকিস্তানীরা পাকিস্তানের কোন মসজিদে বসে আল্লার ধ্যান ধারণা করবেন, এর জন্য সবাইকে মিলে এক রাষ্ট্র তৈরী করতে হবে–এমন একটি বিশ্বাস সৃষ্টি কি একান্তই প্রয়োজন বা সম্ভব?"

চতুর্থ আলোচনাকারী মীর আবুল হোসেন সাহেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অধিকতর নিরপেক্ষতার সহিত তাঁহার বক্তব্য পেশ করিয়াছেন।

পঞ্চম আলোচনাকারী ওমর কোরায়শীর লেখা মাত্র সেদিন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্থানাভাবে তাহা ছাপানো সম্ভব হয় নাই।

আলোচনাঃ

অন্নদাবাবু বলিয়াছেন–পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী হইয়া পড়িবেন। এ কথায় সত্য আছে।

পৃথিবীতে আজ জতীয়তাবাদের জয়–জয়কার চলিয়াছে–স্ব স্ব দেশকে বিপদ–মুক্ত করার বা অপর দেশের ক্ষতি করিয়া হইলেও নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করার একটা প্রতিদ্বন্দিতা অবাধ গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় পাকিস্তানের মুসলমানরাও যে অধিকতর পাকিস্তানী হইয়া পড়িবেন তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে–পাকিস্তানের (এমনকি ভারতেরও বলি না কেন) মুসলমানরা আদর্শগতভাবে অন্য দেশের মুলমানদের সঙ্গে একত্মতা অনুভব করিবে না (পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতিও একথা প্রযোজ্য)। তিউনিসিয়া মরক্কো, ইরান, মিশর প্রভৃতি দেশে যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অত্যাচার চলিতেছে–তজ্জন্য ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের চাইতে যে পাকিস্তানের জনসাধারণ বেশী আন্দোলন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্নদাবাবুর ভাষায় "ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছে"–এখানেও পাকিস্তানের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করিবে।

জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর বহ সংঘর্ষ ও শোষণের জন্য দায়ী বলিয়া গফুর সাহেব যে মন্তব্য করিয়াছেন–তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি পাকিস্তানেও ইসলামের দিন ফুরিয়ে আসল" একথা অন্নদাবাবু বলিয়াছেন বলিয়া যে মন্তব্য

www.pathagar.com

করিয়াছেন–তাহা ঠিক নয়। অন্নদাবাবু তাঁহার প্রবন্ধের কোথাও ইহা বলেন নাই। গফুর সাহেব এখানে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অন্নদাবাবু তুরস্কের দৃষ্টান্ত দিয়া শুধু বলিতে চাহিয়াছেন–পাকিস্তান হইতে ধর্মীয় কুসংস্কার ও তথাকথিত গোঁড়ামীই বিলুপ্ত হইবে। এই বিলুপ্তি তো প্রত্যেক খাঁটী মুসলমানই মনে প্রাণে কামনা করে। কারণ ইসলামই কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী।

নূরুল আফছার সাহেব যে বলিয়াছেন জাতীয়তার প্রধান ভিত্তি সাধারণ স্বার্থবোধ আর তা বেশীর ভাগই ভৌগোলিক সীমা রেখার উপর নির্ভরশীল'–একথা অস্বীকার করিবে কে? কিন্তু এই জাতীয়তাই আমাদের আদর্শ হওয়া কেন উচিত তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি আর একটি ভুল করিয়াছেন–ইসলামকে শুধু 'আল্লার ধ্যান ধারণা' বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। ইসলাম কিন্তু তা নয়। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক আধ্যাত্মিক প্রভৃতি মানুষের সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পদ্ধতিই ইসলাম। কোরাণকে যাঁহারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীতে পড়িয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহা স্বীকার করিবেন।

জিম্মী সমস্যাকে যে পাকিস্তানের বড় সমস্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে আমাদের মতে তাহা ঠিক হয় নাই। পাকিস্তানের আইনে মুসলমানদের মতই সংখ্যালঘুরা সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করার জন্য এখানের সরকার ভারত সরকার হইতে কম আগ্রহশীল একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। তবু অন্নদাবাবু জিম্মী সমস্যাই পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা বলিয়া ইহাকে এতো গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

জিম্মী ঐতিহাসিক শব্দ। সেই সুদূর অতীতকালে যে সমস্ত লোক মুসলমানদের সংগে সব সময় শত্রুতা করিয়া কিংবা যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইত তাহারা যাহাতে কোনও মতে বিজয়ীদের হাতে অত্যাচারিত না হয় তজ্জন্য এই শব্দের প্রচলন হইয়াছিল। ইহা তখন অত্যন্ত সম্মানজনক শব্দ হিসাবেই ব্যবহৃত হইত এবং যাহারা জিম্মীরূপে পরিগণিত হইতেন তাহারা তজ্জন্য নিজেদের খুবই নিরাপদ ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু জাতির মত বিজেতাদের হাতে–কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, Forced labour, সম্প্রদায়িক দাংগা প্রভৃতি মারফত যে অমানুষিক ব্যবহার পায়–তাহার সংগে তুলনা করিলে জিম্মী ব্যবস্থা যে কত মানবীয় ও উন্নত ব্যবস্থা ছিল তাহার ইংগিতই যথেষ্ট।

মানুষের মনোবৃত্তির সংগে আমরা সম্যক পরিচিত নই বলিয়াই আমরা জিম্মী শব্দ লইয়া ভুল ধারণা পোষন করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে–রাষ্ট্র সব সময় পুলিশী শক্তি দ্বারা দুর্বলদের রক্ষা করিতে পারে না। আর পারে না বলিয়াই ভারত–পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘুরা (সে রাজনৈতিক সংখ্যালঘুই হউন কিংবা ধর্মীয়ই হউন) সরকারের শত সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্বেও দাংগা ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় নাই। অন্নদা

www.pathagar.com

বাবু বলিয়াছেন, সংখ্যালঘুরাও রাষ্ট্রের নাগরিক। সুতরাং তাহাদের রক্ষা করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। কথাটা সত্য–কিন্তু আংশিক। নাগরিকদের সহযোগিতা যদি রাষ্ট্র না পায়–তাহা হইলে রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের সব সময় রক্ষা করিতে পারে না। এ অবস্থায় নিরাপত্তার বড় উপায় হইল সংখ্যালঘুদের প্রতি কর্তব্য বোধ জাগানো। পুলিশী শক্তি দ্বারা রাষ্ট্র যাহা পারে নাই গান্ধিজী সংখ্যাগুরুদের মনে সংখ্যালঘুদের প্রতি কর্তব্য বোধ জাগাইয়া তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; পাকিস্তানে আলতাফ হোসেন আর ভারতে গান্ধিজী যে প্রাণ হারাইলেন তাহা এই কর্তব্য বোধে উদবুদ্ধ হইয়াই। এই কর্তব্য রোধই জিম্মী বোধের মূল কথা। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিপ্লবের সময়ে যখন এমন একটা ভাবপ্রবণতার (Emotion) সৃষ্টি হয় যে সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য সত্বেও নিরাপদ মনে করেন না তখন মানবতাবোধ বা কর্তব্যবোধই প্রধান রক্ষা কবজ। জার্মানীতে নাৎসীদের যদি কমুনিষ্টদের প্রতি, আমেরিকায় সাদা আদমীদের যদি নিগ্রোদের প্রতি এবং রাশিয়াতে কমুনিষ্টদের যদি ট্রটস্কাইটস বা অন্যান্যদের প্রতি বর্তব্যবোধ থাকিত–আর বর্মা সিংহলের ভারতীয়দের প্রতি বার্মিজ বা সিংহলীদের এবং ভারত–পাকিস্তানের সখ্যালঘুদের প্রতি যদি সংখ্যাগুরুদের দায়িত্ববোধ ভালোভাবে উজ্জীবিত থাকিত, তাহা হইল এইসব দেশে সংখ্যালঘুদের মৃত্যু–বিভাষিকা কিছুতেই নারকীয় রূপ ধারণ করিতে পারিত না। অতএব জিম্মী–ধারণা অত্যন্ত প্রগতিশীল, এবং মানবতাবোধের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

এখানে একথাও বলা দরকার যে জিম্মী–ধারণা সব সময়ের ধারণা নয়, ইহা নিতান্তই সাময়িক (Emergency)। নিরাপদ সময়ে জিম্মী–কথাটাই অবান্তর। যখনই গণ–ভাবপ্রবণতা (Mass sentiment) রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্য কারণে মানুষকে পশুর স্তরে লইয়া যায়–তখন কর্তব্যবোধ জাগানোর একান্ত অপরিহার্যতা দেখা দেয়। পাক–ভারতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু–মুসলমান যাহারা সংখ্যাগুরুদের হাতে মানবীয় আশ্রয় পাইয়াছে তাহা এই বোধ হইতেই–সরকারী পুলিশী শক্তির দ্বারা নয়। ইহার শুভ উন্মেষ যদি সর্বত্র সম্ভব হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে অত্যাচার–অবিচার বলিয়া কিছুই থাকিত না। এমন কি দিল্লীতে সেদিন (জুন, ৫২) মুসলমান তরুণ ও হিন্দু তরুণীর বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া যে হাংগামা ও রক্তারক্তি হইয়া গেল কর্তব্যবোধ জাগ্রত থাকিলে তাহাও সম্ভবপর হইত না।

'নতুন' অধ্যায়ে প্রধানত জাতীয়তাবাদের প্রশ্নই আলোচিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদই যে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত একথা জোর করিয়া বলা চলেনা। ইংলন্ডের কিংবা ভারতের কম্যুনিষ্টরা ইংলন্ডের গর্ভণমেন্ট বা ভারতীয় গর্ভণমেন্টের চাইতে রাশিয়ান গভর্ণমেন্টকে বেশী পছন্দ করে। ইহা জাতীয়তার পরিপন্থী।

মুসলমানদের প্রতিও একথা প্রযোজ্য, আদর্শ দ্বারা যে ভৌগলিক সীমা ভাঙিয়া বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যায় তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

সমস্ত মানুষ ভাই ভাই, মানব সমাজ এক জাতি'–এই মহান নীতির দিকেই আজ মানব সমাজ আগাইয়া চলিয়াছে। শোষণ, অত্যাচার ও সংঘর্ষ হইতে মানব সমাজকে মুক্ত করিতে চাহিলে ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পৃথিবীতে এক গভর্ণমেন্ট স্থাপন আজ আর বিলাস–স্বপ্ন নয়। হিংসা–দ্বেষহীণ মানবতার মহান আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা সেই লক্ষ্যে পৌছাইতে পারি। পাকিস্তানের নতুন অধ্যায়ে যেন এই লক্ষ্যে পৌছার প্রচেষ্টা হয় ইহাই আমাদের কামনা।

১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা–ভাদ্রঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ইতিহাসের ধারা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোহাম্মদ আজরফ	২৮১–৩০১
দুরন্ত ঢেউ (নাটিকা)	আসকার ইবনে শাইখ	৩০৩–৩১৭
দৃষ্টি (গল্প)	আবদুর রহমান	৩১৮–৩২৪
ওই আকাশে ঃ তেপান্তরে (কবিতা)	আশরাফ সিদ্দিকী	৩২৫–৩২৬
পদাবলী ঃ সংস্কৃতি বিষয়ক (ব্যঙ্গ কবিতা)	হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী	৩২৭–৩২৮
পল্লী–গীতি	রওশন ইজদানী	৩২৯
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৩৩০–৩৩১

আজাদীর দিনে ঃ

আজাদীর ষষ্ঠ বার্ষিকীর আনন্দোৎসবে যোগ দিতে গিয়ে আজ মনে পড়ছে পাঁচ বছর আগের সেই সাতচল্লিশের আনন্দোৎসবের কথা। সেদিন আর এদিন–অনেক তফাৎ। সাতচল্লিশের ১৪ই আগস্ট রাত বারোটার ওপারে ছিল গোলামী, এপারে আজাদী; ওপারের আকাশ দুর্ভাগ্যের কালোমেঘে ঢাকা, এপারের আকাশ নির্মেঘ, সুনীল, অসীম। নতুনের স্বপ্নে জীবনের গানে মন ছিল মুখর। মহানন্দে উল্লসিত কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত–হয়েছিলঃ পাকিস্তান জিন্দাবাদ। '৫২–এর সেই রাতে বারোটার ওপারেও আজাদী এপারেও আজাদী। কিন্তু কই, আজাদ মানুষের দৃপ্ত জয়োল্লাসে দেশের আকাশ বাতাস ভরে উঠছে না তো।

এ শুভ মুহূর্তে শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনি সময়ে আমরা আজাদ হয়েছিলাম, স্বপ্ন দেখেছিলাম নতুন দেশের, নতুন জগতের।

সে দেশ পেয়েছি?

উত্তর দিতে মন মুষড়ে পড়ে।

দেশবাসীর প্রায় কোন সমস্যাই তো মিটল না। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠল না আজাদীর আনন্দ প্রতি ঘরে ঘরে। গাঁয়ের চাষী আজও তেমনি রোগজর্জর–অনাবৃত দেহে, পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে প্রধানীর ক্ষেতে দিনমান কাজ করে; খড়ের ফুটো চালের নীচে বসে

www.pathagar.com

রুগ্ন শিশুকে বুকে চেপে তেমনিভাবে রাত কাটায় কিষাণ বৌ! কেরানীর ঘরে চাল ডালের অভিযোগ আজও শেষ হল না, শেষ হল না দরিদ্র শিক্ষকের আকুল ফরিয়াদ।

স্বপ্নমাখা সুখের দিন!

সুখের সেদিন কি আসবে না?

বীর তরুণ বুকের তাজা খুনে সেদিন লিখে গেছেঃ আসবে। যে নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, সেকি আর আঁধার গুহায় আটকে থাকতে পারে? কোন বাধা কি তাকে আটকে রাখতে পারে? পারে না।

যৌবন আজ জাগ্রত, পথের বাধাকে সে জয় করবেই, পৌছবেই তার স্থির লক্ষ্যে, সেই স্বপ্নের দেশে।

আজও অভিযাত্রীর সম্মুখে 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার।' দেশের সাহিত্যিক নতুন পথের দিশারী। পথ দেখানোর সুমহান কর্তব্য তাঁদের উপর ন্যস্ত। রাত্রির কালো বুকে আলোর জোয়ার এনে তাঁরা পারেন জাতির ভাগ্যাকাশকে আলোকোদ্ভাসিত করতে।

বাংলার সাহিত্যিক বহুদিন সাধনা করে আসছেন, সে সাধনা বন্ধন মুক্তির। সর্বদিকের বন্ধন থেকে জাতিকে মুক্ত করবার জন্য এই যে সাধনা, আজাদী লাভের পরও এর শেষ হয়নি। এ সাধনা চলছে, চলবে। যতদিন 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশ বাতাসে' ধ্বনিত হতে থাকবে, 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে' রণিত হবে, ততদিন পাকিস্তানের দরদী সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁদের সাধনা পালন করে যাবেন। আঁধার ঘেরা, স্বপ্নভাঙ্গা আজাদীর ষষ্ঠ বার্ষিকীর পবিত্র মুহূর্তে এই আমাদের স্থির ও দৃঢ় সংকল্প।

তাঁদের কথা আজ মনে পড়ছে, যাঁরা বিদেশীর কবল মুক্তির সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন, যাঁরা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, যাঁরা জাতির দাবী জানাতে গিয়ে হাসিমুখে মরণকে বরণ করছেন। তাঁদের সকলের পবিত্র স্মরণে আজ সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা জানাই। এই শুভক্ষণে কামনা করিঃ তাঁদের আশা যেন সফল হয়, তাঁদের আদর্শ যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
আপনার চিঠি থেকে	অন্নদাশঙ্কর রায়	৩৩২

সবিনয় নিবেদন,

সম্পাদক সাহেব, 'দ্যুতি' নিয়মিত পাচ্ছি। গল্পগুলির তারিফ করছি। প্রবন্ধগুলিও উচ্চাঙ্গের হচ্ছে। আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। হিন্দু-মুসলমানদের কথা, ভারত-পাকিস্তানের কথা আমার দিবা-রাত্রির ভাবনা। কিন্তু ভাবনাকে আর দশজনের কাছে হাজির করা খুব কঠিন কাজ। পূজোর পরে আমি আবার এ বিষয়ে লিখতে বসব। আপাততঃ অন্য কয়েকটি লেখা শেষ করতে হবে। আমার আদাব জানবেন।

বিনীত-

অন্নদাশঙ্কর রায়

www.pathagar.com

১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা, আশ্বিনঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বিদ্রোহী পদ্মা (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৩৩৩–৩৪৮
তৌহিদবাদঃ বাংলা কাব্য ও নজরুল (প্রবন্ধ)	আতোয়ার রহমান	৩৪৯–৩৫৯
মানুষ (গল্প)	প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ	৩৬০–৩৬৭
সাহিত্যের নবজন্ম (প্রবন্ধ)	অধ্যাঃ সৈয়দ বদরুন হুসেন	৩৬৮–৩৭১
বিতর্কিকা		
আধুনিক সাহিত্য	কাজী ফজলুর রহমান	৩৭২–৩৭৬
তাদের ভুলে যেয়ো না (কবিতা)	প্রজেশ কুমার রায়	৩৭৭
শহরে সন্ধ্যা (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	৩৭৮–৩৭৯
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৩৮০

১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা–কার্তিকঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বার্নাড শ' (প্রবন্ধ)	ভবেশ মুখোপাধ্যায়	৩৮১–৩৮৫
একটি জীবন (গল্প)	মুযহারুল ইসলাম	৩৮৬–৩৯১
স্বগত (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফর রহমান	৩৯২–৩৯৪
সৈনিকের গান (কবিতা)	এ, এস, এম, আবদুল জলীল	৩৯৫
ধর্ম–নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	৩৯৬–৪০৩
অনুরণন (গল্প)	মোজাম্মেল সিদ্দিক	৪০৪–৪০৮
বিদ্রোহী পদ্মা (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৪০৯–৪২০
দ্যুতি (কবিতা)	প্রজেশ কুমার রায়	৪২১
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৪২২

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

গত ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর ঢাকার কার্জন হলে অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' হয়ে গেল। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বিদেশ থেকে যে সব প্রতিনিধি ও মনীষীবৃন্দ যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার আহমদ বিন আহমদ, লাহোরের 'তাসনীম' পত্রিকার সম্পাদক জনাব নসরুল্লাহ খান আজিজ, পাকিস্তানের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মজহার উদ্দিন সিদ্দিকী ও লন্ডনের ওকিং মসজিদের প্রাক্তন ইমাম জনাব আফতাবুদ্দিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দূর–দূরান্ত থেকে যাঁরা পূর্ব–

www.pathagar.com

পাকিস্তানের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন তাঁদের ছাড়াও এ দেশের আনাচ-কানাচ থেকে ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আহবানে সাড়া দিয়েছেন অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মী ও চিন্তাবিদ। এই সম্মেলনের চার দিবসব্যাপী অধিবেশন শুধু পাকিস্তানের নয়, প্রাচ্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন সত্যই সাংস্কৃতিক জগতে একটি সুদূর প্রসারী আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। যে আদর্শকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি, যার জন্য লক্ষ লক্ষ পাক-ভারতের আদম সন্তান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে-তার সম্বন্ধে এমন বিজ্ঞান-নির্ভর সুষ্ঠু ধারণা আর কোন অনুষ্ঠান দিতে পারেনি। অজ্ঞতা, স্বার্থান্ধতা এবং পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণপ্রিয়তা যেভাবে আমাদের পংগু করে রেখেছে-যেভাবে মানবের স্বভাব-ধর্ম ইসলামকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ধূম্রজালের সৃষ্টি করা হয়েছে- তার বিদুরণের জন্য এমন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

অতীতে অনেক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। প্রায় সবটাতেই দেখেছি সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির চাইতে ধনীদের ও পদ-প্রার্থীদের প্রদর্শনীর মহড়া, অর্থব্যয়ের আড়ম্বর-চাঞ্চল্য এবং হৃদয়ের চাইতে মস্তিষ্কের বাড়াবাড়ি। আর এই সম্মেলন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে একদল দরিদ্র নিঃস্বার্থ কর্মী দিনরাত পদ-আরাম-আয়াস হারাম করে সর্বনিম্ন ব্যয়ে একটা বিরাট সাফল্যের অধিকারী হতে পারে।

চারদিনব্যাপী এতগুলি শাখা, এতগুলি অধিবেশন অন্য কোন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, মহিলা অধিবেশন, প্রকাশ্য সম্মেলন, প্রতিনিধি সম্মেলন, কর্মী সম্মেলন, মফস্বলের কবি-জারী-বাউল-গাজী প্রভৃতি লোক-সংস্কৃতির অপূর্ব অনুষ্ঠান প্রায় প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত একই সময়ে একাধিক অধিবেশন-সত্যি অপূর্ব। এর অভিভাষণগুলিও অপূর্ব এবং অসাধারণ। প্রায় চল্লিশটি অভিভাষণের মধ্যে যে ২০টি অভিভাষণ ছাপা হয়েছে দু'একটি বাদ দিলে তার সব কয়টিই মননশীলতায়, যুক্তিবিজ্ঞানে ও সমস্যা-সমাধানের ইংগিতে সম্পদশালী।

'যেন তেন প্রকারেণ' অভিভাষণ দিয়ে নাম জাহির করার প্রচলিত রেওয়াজ-এর একটিতেও নেই। সর্বপ্রকারের মিথ্যা আবর্জনা দুরীভূত করে আমাদের বর্তমান বিভ্রান্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্ত করে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর মহৎ পথ প্রদর্শনের মহান ব্রতই অনুষ্ঠান ও অভিভাষণগুলির প্রতিটি ধাপে ও ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা এই মহান সম্মেলনের কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয়ে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে এ রকম সুষ্ঠু সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যত বেশী হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।

www.pathagar.com

১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা–অগ্রাহায়ণঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
পূর্ব–পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য সাহিত্য (প্রবন্ধ)	আবদুর রশীদ খান	৪২৫–৪৩১
সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা (প্রবন্ধ)	আহমদ ফরিদ উদ্দিন	৪৩২–৪৩৬
মোনালিসা (গল্প)	সৈয়দ মোকসুদ আলী	৪৩৭–৪৪১
নয়া খিলাফত (গান)	ফররুখ আহমদ	৪৪২–৪৪৩
এলো ঐ ইসলামী বিপ্লব (গান)	মফিজ উদ্দিন আহমদ	৪৪৩–৪৪৪
সূর্য–সারথি (কবিতা)	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	৪৪৫–৪৪৭
সংহতি (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	৪৪৮
কাছাকাছি (গল্প)	আতোয়ার রহমান	৪৪৯–৪৫১
বিদ্রোহী পদ্মা (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৪৫২–৪৫৯
লেখক (গল্প)	রাবেয়া খাতুন	৪৬০–৪৬৫
সমালোচনা সাহিত্য		
বোবামাটি (গল্পগ্রন্থ, রচনাঃ	নূরুন নাহার) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৪৬৬–৭৬৭

১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা–পৌষঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
আমাদের কথা সাহিত্য (প্রবন্ধ)	শাহেদ আলী	৪৬৯–৪৮০
মেহের জা'নের মা (বড় গল্প)	মির্জা আ. মু. আব্দুল হাই	৪৮১–৪৯৬
অন্যথায় (কবিতা)	মোহাম্মদ মামুন	৪৯৭–৪৯৮
তবুও (কবিতা)	আজীজুল হক	৪৯৮–৪৯৯
ইতিহাস (কবিতা)	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	৫০০
অমর্ত (গল্প)	আবদুল গাফফার চৌধুরী	৫০১–৫০৬
ধর্ম–নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	৫০৭–৫১০
সমালোচনা সাহিত্য		
'পাকিস্তানের পাঁচ বছর'	নূরুল আলম	৫১১–৫১৩

পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে 'পাকিস্তানের পাঁচ বছর' শীর্ষক একটি স্থূলকায় প্রচার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের সাহায্যে ও নেতৃত্বে প্রচুর টাকা খরচ করিয়া ইহাতে যেসব হাস্যকর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্যিই অভাবিতপূর্ণ। বিশেষ করিয়া ইহার 'শিল্প–সাহিত্য' নিবন্ধে পূর্ব বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা হাস্যকর প্রমাদ ও যথেচ্ছাচারে পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

কোনো দেশের সরকারের তরফ হইতে সেই দেশের সাহিত্যের এইরূপ বিকৃত প্রচারনা হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণারও অতীত। কাজেই আমরা 'পাকিস্তানের পাঁচ বছর' পুস্তকের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া কেবল ইহার 'শিল্প সাহিত্য' শীর্ষক অধ্যায়টির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

'শিল্প সাহিত্য' নিবন্ধটিতে ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী যে সাহিত্য আলোচনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে উর্দু সাহিত্যে ১২ পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়াছে, আর বাকী তিন পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে 'বাংলা সাহিত্য'। স্থান নিয়া না হয় সমালোচনা বাদই দিলাম–কিন্তু বিষয়বস্তুতে যেভাবে বাংলা সাহিত্যের বিকৃত প্রচারণা করা হইয়াছে তাহা সত্যই পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য লজ্জা ও কলংকের বিষয়। আমাদের আলোচ্য পুস্তকটি উর্দু, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পাকিস্তানের বাহিরেও বিলি করা হইয়াছে। পূর্ব বাংলার সাহিত্যের এরূপ বিকৃত প্রচারণা যে সরকারের মারফতই করা হইবে তা কে জানিত!

বাংলা ভাষার উপর আলোচনাটির লেখক* হইলেন 'ইউসুফ জামাল হোসাইন'। এই নামের কোন সাহিত্যিক বা সাহিত্যমোদী পূর্ব বাংলায় আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। যে পুস্তকটির Original ও Translation দেশ–বিদেশের সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে সেইরূপ একটি প্রামাণ্য পুস্তকের সাহিত্য বিভাগের রচয়িতা যে একজন সুপরিচিত সাহিত্যিক হওয়া প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। লেখকের অবাংগালীসুলভ নাম ইঙ্গিত করে যে; তা লেখকের আসল নাম নয়। যথেচ্ছা লিখিয়া টাকা আদায় ও বিশেষ একটা উদ্দেশ্য সাধনই লেখকের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়।

প্রবন্ধের প্রথমে দুর্বোধ্য ও প্রমাদপূর্ণ একটি প্রস্তাবনার অবতারণা করিয়া বর্তমান পূর্ববাংলার ভাষার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন–"চতুর্দশকের গোড়ার দিকে অধিকাংশ মুসলিম কবি একটি নূতন পথের সন্ধান শুরু করেন। টেকনিকের দিক থেকে তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে শুরু করেন। কাব্যছন্দের নূতনত্ব তখন সচ্ছন্দভাবে বিকাশ লাভ করেছে। গদ্য কবিতা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কবিত্বময় ভাষা সাধারণের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে"—লেখকের সেই প্রলাপোক্তির সম্যক অর্থ আমরা অনেক গবেষণা করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। 'চতুর্দশক' বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চান–'গদ্য কবিতা কখন ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই অতীতে না বর্তমানে আর 'কবিত্বময় ভাষা' কখন সর্বসাধারণের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আমরা সত্যই জানি না। আর এই রকম বহু 'চিজ'ই তিনি 'পাকিস্তানের পাঁচ বছরে' পরিবেশন করিয়াছেন।

এরপর দুই প্যারায় নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে স্রেফ আবোল–তাবোল বলিয়া তিনি

---

* আইয়ুবী আমলের শেষ দিকে ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ঢাকায়। তিনি একজন মহিলা। পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে তখন তিনি উচ্চপদে সমাসীন। –আসকার ইবনে শাইখ

www.pathagar.com

আমাদের সামনে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পেশ করিয়াছেন আবুল হোসেন—এই 'তরুণ কবি'কে। এখানে জসীমুদ্দীন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব এঁরা সবাই তলাইয়া গিয়াছেন। পুরাতন কালের রাজা-বাদশাদের প্রতি ভক্ত কবির বন্দনার মতো একটানা প্রশংসার ঝড় যে দুই পাতায় রহিয়া গিয়াছে তাহার পর রহিয়াছে-"আবুল হোসেনের কবিতায় আছে 'লরেন্সের ভাব বিপ্লব'-'হাকসলীর বস্তুবাদ'। তার লেখায় পুরানো শব্দের বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না"—ভদ্রলোককে নিয়া এইভাবে ক্যারিকেচার বা ব্যঙ্গ করার কি প্রয়োজন ছিলো বুঝা গেল না।

এরপর লেখকের লেখনীর চোটে কবি ফররুখ আহমদ একজন শ্রেষ্ঠ গীতি কবি এবং গদ্য কবিতার লেখক বনিয়া গিয়াছেন। গল্পে শাহেদ আলী, মাহবুব-উল-আলম, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আতোয়ার রহমান, মির্জা আ. মু. আবদুল হাই প্রভৃতি খ্যাতনামা ও প্রতিশ্রুতিশীল গাল্পিকদের নাম একদম গুম হইয়া গিয়াছে। তৎস্থলে যে সমস্ত লেখক-লেখিকার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশের নাম এখনও সাহিত্যালোচনায় স্থান পাইবার যোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে 'মাহে নও'-এ প্রকাশিত কয়েকটি গল্পকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনীয় বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। অথচ আমাদের মতে, উল্লেখিত গল্পগুলির অধিকাংশ এতোই নিকৃষ্ট ধরনের যে, পৃথিবীর যে কোন প্রথম শ্রেণীর গল্প লেখকের তৃতীয় শ্রেণীর গল্পের সঙ্গেও তুলনীয় হইতে পারে না। লেখকের কলমের ও জ্ঞানের মহিমায় আশরাফ সিদ্দিকীর কবিত্ব কাটিয়া গিয়া তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গাল্পিক বনিয়া গিয়াছেন। নাট্যে-ইব্রাহিম খাঁ, আসকার ইবনে শাইখ, নূরুল মোমেন প্রমুখ যাঁহাদের বই প্রকাশিত হইয়া রীতিমতো মঞ্চস্থ হইতেছে তাঁহাদের নাম নিশানাও নাই, অথচ নাট্য সাহিত্যে এমন একজনের নাম করা হইয়াছে যাঁহার কোন বই নাই।

অর্বাচীনসুলভ মন্তব্য আর উদ্দেশ্যমূলক আলোচনায় সমস্ত প্রবন্ধটি ভরপুর। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, পূর্ববঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে এরূপ একটি বিকৃত আলোচনা সরকারী প্রচার পুস্তকে প্রকাশ করিতে পাকিস্তান সরকারের হাজারী বড় কর্তাদের এতটুকু দ্বিধা হয় নাই। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, সরকার কেবল 'মাহে-নও' পত্রিকাকেই পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের মাপকাঠি হিসাবেই ধরিয়া নিয়াছেন। কিন্তু সরকারের একথা বুঝা উচিত ছিল যে, 'মাহে-নও' পত্রিকা অপেক্ষা অধিক উঁচু Standard-এর পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট রহিয়াছে। এবং এমন অনেক লেখক রহিয়াছেন যাঁহারা 'মাহে-নও' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের আলোচনা কেবলমাত্র 'মাহে-নও' পত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না এবং আলোচনাকারীও একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক হইবেনই। কিন্তু আমরা সেইদিক হইতে নিরাশ হইয়াছি। সরকারী প্রচার কর্তাদিগকে আমরা বলিয়া দিতে চাই, যে বিষয় সম্পর্কে আপনাদের কোন জ্ঞান নাই-তাহা নিয়া ছিনিমিনি খেলিলে দেশের সংস্কৃতিকামীরা তাহা কোন দিনই ক্ষমার চক্ষে দেখিবে না।

www.pathagar.com

১ম বর্ষঃ ১১শ সংখ্যা–মাঘঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
শ'য়ের চিঠি (প্রবন্ধ)	আতাউল হক	৫১৫–৫২১
ইঁদুর (গল্প)	চৌধুরী লুৎফর রহমান	৫২২–৫২৮
মানুষের গান (কবিতা)	মফিজউদ্দিন আহমদ	৫২৯–৫৩০
রুবাইয়্যাত (কবিতা)	মুহম্মদ আবু তালিব	৫৩১
হেমন্ত কামনা (কবিতা)	মোহাম্মদ আজিজুল হক	৫৩২–৫৩৩
সেথায় দেখেছি (কবিতা)	নূরুন নাহার বেগম	৫৩৩–৫৩৪
হেজাজী হাওয়া (গল্প)	অধ্যাপক মোহাম্মদ আজরফ	৫৩৪–৫৪১
গণ সাহিত্যের ভিত্তি (প্রবন্ধ)	রওশন ইজদানী	৫৪২–৫৪৬
সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আবুল কাসেম	৫৪৭–

দ্যুতি

[মাসিক সাহিত্য পত্র]

২য় বর্ষঃ ১ম সংখ্যা–ফাল্গুনঃ ১৩৫৯; ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

সম্পাদকঃ আসকার ইবনে শাইখ

সহ-সম্পাদকঃ চৌধুরী লুৎফর রহমান

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রগতিঃ মত ও পথ (প্রবন্ধ)	আহমদ ফরিদউদ্দিন	১–৮
ব্যাহত বন্যা (গল্প)	আতোয়ার রহমান	৯–১৯
বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ (প্রবন্দ)	মূলঃ বার্টরান্ড রাসেল অনুবাদঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	২০–২৭
একটি মাত্র প্রাণ (গল্প)	সৈয়দ আতাউর রহিম	২৮–৩৪
মন ও সমুদ্র (কবিতা)	হাবীবুর রহমান	৩৫
তুমি কি কেবলই ছবি (কবিতা)	আবদুর রশীদ খান	৩৬–৩৭
স্বগত (কবিতা)	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	৩৮
পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ–সাহিত্য (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন	৩৯–৪৬

www.pathagar.com

নাবিক (গীতি-গাঁথা)	গীতিকারঃ ফররুখ আহমদ সুরঃ শেখ লুৎফর রহমান স্বরলিপিকারঃ অধ্যাপক মুনসী রইসইদ্দিন	৪৭-৫২
সংস্কৃতি সংবাদ		
আর্ট স্কুলের চিত্র-প্রদর্শনী	বদরুল মুনীর	৫৩-৫৫
পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমিতি	নূরুল আলম	৫৫-৫৬
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৫৭-৫৮

ভাষা আন্দোলনের শহীদ ভা'য়েরা
তোমাদের ভুলিনি
আল্লাহ তোমাদের শান্তি দিন
তোমাদের আশাকে যেন
সফল করতে পারি!

২য় সংখ্যাঃ চৈত্র, ১৩৫৯ মার্চ, ১৯৫৩

লেখনিরোনাম	লেখকেরাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কাঁটা (গল্প)	শাহেদ আলী	৬৫-৬৯
এক টুকরো ভ্রমণ (ব্যক্তিগত প্রবন্ধ)	আতোয়ার রহমান	৭০-৭৭
চাচী আম্মা (গল্প)	সৈদয় মোকসুদ আলী	৭৮-৮৩
জয়নুল আবেদীন (প্রবন্ধ)	মূলঃ কামরুল ইসলাম অনুবাদঃ নূরুল আলম	৮৪-৮৮
পরিণাম (গল্প)	মূলঃ দোদেঁ (ফ্রান্স) অনুবাদঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক	৮৯-৯৫
গান গেয়ে যাই (কবিতা)	আশরাফ সিদ্দিকী	৯৬-৯৭
নাবিকঃ সমুদ্র (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	৯৮-১০১
মাটির প্রেম (কবিতা)	খোন্দকার আবদুর রহীম	১০১
আমার দেশ		
ঢাকা নগরী	আবদুল কুদ্দুছ	১০২-১০৫
সংস্কৃতি সংবাদ		
বিচিত্রানুষ্ঠান ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা সভা	আহমদ সিরাজ	১০৬-১১০

বিচিত্রানুষ্ঠানঃ গত কিছুদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চারটি হলের নবনির্বাচিত ইউনিয়নের অভিষেকোৎসব হয়ে গেল। অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেশের সুশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের সংস্কৃতি চেতনার রূপ ওগতিধারার প্রকাশ এগুলোতে রয়েছে।

কিছুদিন আগেকার কথা। ঢাকায় ইসলামী সংস্কৃতি সম্মেলন হয়ে গেল অক্টোবর মাসে। এ সম্মেলনের বিচিত্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে একজন ভিন্ন মতাবলম্বী কোন এক কাগজে লিখেছিলেনঃ ইসলামী সম্মেলনে সলিল চৌধুরীর শান্তির গান শুনে.....ইত্যাদি। এই 'একজন' সলিল বাবুদেরই মতের ধারক। কথাটা তিনি ঠিক বলেননি। ভাল কথা- যেই বলুক-সব সময়, সব জায়গায়ই ভাল। সলিল বাবুর গান বলেই ইসলামপন্থীরা তা গাইতে পারবে না, এটা কোন কাজের কথা নয়। কথাটা মনে পড়ল সলিমুল্লাহ হলের 'শান্তি' নামক গীতি-বিচিত্রা প্রসঙ্গে। গানগুলো যাদের লেখাই হোক না কেন, আবেদন ছিল তার দলমত নির্বিশেষে। তারপর ফজলুল হক হলের অনুষ্ঠান। সেখানেও গীতি-বিচিত্রা হয়েছে। 'আমার দেশ' পরিবেশন করেছেন ওঁরা। কিন্তু এই গানের জীবন্তিকায় কোথাও এবং কোন সময়ই আমার দেশকে খুঁজে পেলাম না। গীতি-বিচিত্রাটি একঘেঁয়ে প্রাণহীন হয়েছে। অনেককেই বিরক্ত হতে দেখেছি। গানগুলোতেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। এরপর আসে ঢাকা ও জগন্নাথ হলের মিলিত অনুষ্ঠানের কথা। তাঁরা বসন্তোৎসব করে আসছে প্রতি বছরই। সফলতার দিকে দিয়ে তাদের এটা Tradition-এ পরিণত হয়েছে। এবারে খুব ভাল না হলেও আলোচ্য অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে এ উৎসব সবচেয়ে ভাল লেগেছে। ছাত্রীদের বিচিত্রানুষ্ঠানও একঘেঁয়ে প্রাণহীনতার দোষ থেকে মুক্ত নয়।

এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে একটা জিনিষ বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তা নিজেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তরুণ-তরুনীদের অজ্ঞতা বা অববেলা। যেমন 'আমার দেশ'। পাকিস্তান হওয়ার পর 'আমার বাংলা' মানে পূর্ববাংলা। গানের মধ্য দিয়ে আমার দেশের পরিচিতি পূর্ববাংলারই পরিচিতি। রবীন্দ্র সংগীতের আবেদন বিশ্বজনীন। মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই রবীন্দ্র রচনা থেকে হৃদয়ের অনুভূতি পাবে, এ কথা সত্য। কিন্তু মানুষের তো আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তা আঞ্চলিক। এই হিসাবে রবীন্দ্র সংগীত 'সম্পূর্ণ আমার' নয়। আমি মানুষ, তাই আমার মানবতায় দোলা দেবে রবীন্দ্র সংগীত। কিন্তু আমি তো অস্বীকার করতে পারি না যে, আমি পূর্ববাংলার অধিবাসী! যখন রবীন্দ্র সংগীতের আসরে বা রবীন্দ্র-নাটকের অনুষ্ঠানে যাব, তখন আমি আশাই করব না আমার অঞ্চলকে সেখানে পুরোপুরি দেখতে পাব। কিন্তু যখন আমার দেশের পরিচয় পেতে যাব তখন আশা করবঃ আমার অঞ্চলকে, যে অঞ্চলের সুখে, দুঃখে আমি মানুষ, তাকে দেখতে। এদিক দিয়ে, কই, 'আমার দেশ'-এ তো তা দেখতে পেলাম না? পেলাম পশ্চিম বাংলার একটা অস্পষ্ট পরিচয়-যা পশ্চিম বাংলার ভাইদের কাছে পাওয়ার আশাই আমরা করি।

আঞ্চলিক গানের সুরগুলো তথাকার মানুষের চরিত্র, রীতিনীতির বাহক। আমাদের দেশে আছে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, লোক-সংগীত ইত্যাদি। এ সবের সুরে দেশের সামগ্রিক ছবি প্রতিফলিত। অর্থনৈতিক চাপ যখন ছিল না, তখন এ সবের কথা

www.pathagar.com

যা' ছিল, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তা বেমানান হতে পারে। কিন্তু গানের কথাও যদি পরিবর্তিত হয়, যদি বর্তমানের অবস্থা কথায় প্রকাশিত হয়ে এসব সুরে গীত হয় তবেই আমাদের বর্তমান দেশ প্রতিফলিত হবে। 'আমার দেশ'–এ তা হয়নি। আমাদের পূর্ব বাংলায় রয়েছে পৃথক সুর, পৃথক কথা, পৃথক সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম জড়িত থাকলেও এটা পৃথক। গণিতের অনুপাতেও এই মিশ্র সংস্কৃতির বেশী অংশ মুসলমানের; অন্তত এই পূর্ব–পাকিস্তানে। এ কথা ভুলে গেলে সত্যেরই অপলাপ হবে। আমাদের গীতিকার লিখবেন গান। তাঁর কথায় থাকবে আমাদের বর্তমান মানসিকতা, আমাদের সংস্কৃতির সাজ থাকবে এ সমস্ত গানে। এই গানের কথা যখন আমাদের সুরে গীত হবে, তখনই শুধু মনে করতে পারবঃ এইতো 'আমার দেশ'।

সংস্কৃতি বা আদর্শের ওপর প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার নয়। কিন্তু এই সংস্কৃতি আদর্শের জন্য আমরা যে অনেক কিছু করেছি, তা তো স্বীকার্য! কাজেই পূর্ব–পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষিত তরুণ–তরুণীদের কাছ থেকে আমরা যে সংস্কৃতির পরিচয় পেলাম, তাকে আশাপ্রদ বলি কি করে?

বাংলাভাষা সম্বন্ধে আলোচনা–সভা

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে গত ১১ই মার্চ ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মনীষী এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সভায় আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম আজ বহুদূর এগিয়ে গেছে–গত বছর তরুণ সংগ্রামীদের তাজা রক্ত এ দাবীকে গণমানুষের মধ্যে বিস্তার লাভে অনেকখানি সহায়তা করেছে। আজ পূর্ব–পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শতকরা এমন একজন লোক খুঁজে পাওয়া ভার যিনি এ দাবীর বিপক্ষে। কিন্তু আমাদের বৃহত্তর জনসাধারণ যাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত–তাদের কিছু অংশের মধ্যে বাংলার দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এখনো কিছুটা অস্পষ্টতা ও ভুল বোঝাবুঝি রয়ে গেছে। বাংলা–বিরোধী মহল প্রচার করেছেনঃ

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা অবর্তমান। ইসলামী জীবন–চেতনার সুষ্ঠু বিকাশের দিক দিয়ে উর্দূই আমাদের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হতে পারে। ২. উর্দূর সংগে বাংলাকেও যদি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয় তবে পশতু, সিন্ধী, বেলুচ, গুরুমুখী, গুজরাটী, প্রভৃতি ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উঠবে। এতে করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃংখলাই সৃষ্টি করা হবে। অতএব বাংলাকে পূর্ব–বঙ্গের সরকারী ভাষার চেয়ে বেশী কিছু দাবী করা উচিত নয়।

ইসলাম ও পাকিস্তানের সত্যিকার দরদী আমাদের সরলপ্রাণ জনসাধারণের কারো কারো পক্ষে এই সব চতুর অপপ্রচারের ফাঁদে পতিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই পটভূমিকায় বিচার করলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বার

www.pathagar.com

লাইব্রেরীর আলোচনা সভার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

উপরোল্লিখিত প্রথম অপপ্রচারটির দীত ভাংগা জবাব দেন আলোচনা সভায় প্রথম ও প্রধান বক্তা অধ্যাপক আবুল কাসেম। 'ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা' এই পর্যায়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় অধ্যাপক কাসেম বলেন, 'কোন ভাষাই যে পূর্ণ ইসলামী অনৈসলামী হতে পারে না তার প্রধান প্রমাণ আরবী ভাষা। এক কালের নাস্তিকতা ভাবধারাপূর্ণ আরবী ভাষা আজ অনেকটা ইসলামী ভাবধারার বাহন হয়েছে। কোন ব্যক্তিগোষ্ঠির সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক ঠিকানা একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। কুরআনে এই প্রাকৃতিক নীতির সমর্থনে একাধিক আয়াত রযেছে। এসব সত্ত্বেও যারা উর্দুকে বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, হয় তারা নিবোর্ধ–ইসলামকে জানে না–নতুবা তাদের মনেই রয়েছে শোষণের অভিসন্ধি।

উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় অপপ্রচারের পুংখানুপুংখ আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন তমদ্দুন মজলিস–সম্পাদক জনাব আবদুল গফুর। তাঁর প্রবন্ধে এবং পরবর্তী কয়েকজন বক্তা—অধ্যাপক কাজী কামরুজ্জামান, জনাব আবদুল ওদুদ, জনাব সৈয়দ আবদুর রহীম, জনাব নূরুল আলম, জনাব আবদুল মোমেন তালুকদার, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান প্রভৃতির আলোচনায় একথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে উর্দু ও বাংলার সংগে এবং বিশেষতঃ বাংলার সংগে—পাকিস্তানের পশ্তু, গুজরাটী, গুরুমুখী, বেলুচ প্রভৃতি ভাষার তুলনা চলে না। অতএব উর্দুর সংগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবী করলেই যে অন্যসব ভাষার দাবী উঠবে একথা ভাওতা বই কিছু নয়। তাছাড়া গত পাঁচ বছর ধরে বাংলার দাবীতে আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ যখন উর্দু ছাড়া অন্য কোন ভাষার দাবী উত্থাপন করেনি–তখন ওখানে অন্যান্য ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর জুজু দেখানো শুধু বিভেদের উস্কানী দেওয়া ছাড়া কিছু নয়।

রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃত্বে ভাষার লড়াই আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু সে লড়াই অনেকটা রাজনৈতিক লড়াই। আজ তাঁরা ভাষার দাবীর প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের দিকেও নজর দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁদের মুবারকবাদ জানাই। আমাদের মতেঃ এ ধরনের আলোচনা সভা যত বেশী অনুষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গল। কারণ এসব আলোচনা সভা বা পুস্তক–পুস্তিকা প্রকাশের দ্বারাই আমাদের মধ্যের যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি আমরা দূর করতে পারি।

সর্বশেষে আমরা আরেকটি কথা বলবো। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা—বাংলা না উর্দু', গত বছর ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রাক্কালে কর্মপরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত জনাব আবদুল হাকিম রচিত 'আমাদের ভাষার লড়াই' এবং অধ্যাপক ফেরদাউস খান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের লিখিত এ বিষয়ে কয়েকখানা বই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দু'খানা পুস্তিকাতে ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাভাষা সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রচারের উপযোগী একখানি পুস্তকও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ বা কোনো ভাষা-দরদী সুধী যদি এ সম্বন্ধে একখানি ইংরেজী পুস্তক রচনা করেন তবে ভাষার সপক্ষে একটি সত্যিকার কাজ করা হবে।

সমালোচনা সাহিত্য

আযীমউদ্দীন আহমদ রচিত নাটক 'মহুয়া'র সমালোচনা লিখেছেন কাজী ফজলুর রহমান, পৃঃ ১১১-১১৪

মাটির সুর

কিষাণ কুমারী লিখেছেন মফিজউদ্দিন আহমদ পৃ. ১১৫

২য় বর্ষঃ ৩য় সংখ্যাঃ বৈশাখ, ১৩৬০; এপ্রিলঃ ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বাংলা কাব্যে কবি ফররুখ আহমদ (প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আজরফ	১২১-১৩২
দোটানা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা	১৩৩-১৩৬
বুড়োবট অশ্বত্থের ছায়াতে (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফর রহমান	১৩৭-১৪০
আজ হতে শতবর্ষ পরে (কবিতা)	আজীজুল হক	১৪১-১৪২
ইবনে বতুতার চশমা (নাটিকা)	মা-আ-মৃ	১৪৩-১৪৬
ছায়া-মিছিল (গল্প)	জহরুল আলম	১৪৭-১৫৪
চোর (গল্প)	মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্	১৫৫-১৬৩
রানু ও রহমত আলী (কবিতা)	আসকার ইবনে শাইখ	১৬৪
মাটির সুর		
পাটের 'পোড়া'	রওশন ইজদানী	১৬৫-১৬৭
সংস্কৃতি সংবাদ		
সুসাহিত্যিক মনোজ বসুর সম্বর্ধনা	আবু মোহাম্মদ	১৬৯-১৭২
আমাদের দেশ		
বিক্রমপুর	হেদায়েতুল ইসলাম খান	১৭৩-১৭৫
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		১৭৬
নতুন বই		
অগ্নিফসল (কাব্যগ্রন্থঃ নূরুন নাহার)	নূরুল আলম	১৭৭

২য় বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যাঃ জ্যৈষ্ঠ্য, ১৩৬০; মে ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সন্ধ্যারাতের রূপ কথা (গল্প)	শফিকা হুসেন	১৮৩-১৮৮
ইকবাল থেকে (কবিতা)	অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ	১৮৯-১৯০

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও যুক্তি প্রয়োগ (প্রবন্ধ)	মূলঃ আল্লামা ইকবাল অনুবাদঃ সোলায়মান খান	১৯১–১৯৪
ওয়েসিস (ব্যক্তিগত প্রবন্ধ)	সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন	১৯৫–১৯৯
লাল শিখা (গল্প)	মিজানুর রহমান	২০০–২০৮
ঝড় (কবিতা)	মোহাম্মদ আজিজুল হক	২০৯–২১০
নব জন্ম (কবিতা)	মুযহারুল ইসলাম	২১১–২১২
রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	অনির্বাণ	২১৩–২১৮
মাটির সুর		
ডাহুক	মফিজউদ্দিন আহমদ	২১৯–২২২
আমার দেশ		
পাবনা জেলা	মীর আবুল হোসেন	২২৩–২২৭
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		

২য় বর্ষঃ ৫ম সংখ্যাঃ আষাঢ়, ১৩৬০; জুন ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
মুসলিম পরিবেশ ও পূর্ব বাংলার সাহিত্য (প্রবন্ধ)	সৈয়দ আলী আশরাফ	২৩১–২৩৭
ধর্মীয় সমাজবাদের ভিত্তিতে (প্রবন্ধ)	মীর শামসুল হুদা	২৩৮–২৪৬
ফাঁকি (কবিতা)	চৌধুরী ওসমান	২৪৭–২৪৮
বিক্ষয় (কবিতা)	মুফাখ্খারুল ইসলাম	২৪৯–২৫১
হে সৈনিক (কবিতা)	নূরুন নাহার	২৫১–২৫২
খেলনা (গল্প)	জাহাঙ্গীর খালেদ	২৫৩–২৫৮
মফঃস্বল সংবাদ (গল্প)	মিন্নাত আলী	২৫৯–২৬৬
ওয়েসিস (রম্য রচনা)	সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন	২৬৭–২৬৯
সংস্কৃতি সংবাদ	মোহাম্মদ ফারুক	২৭০–২৭২

২য় বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যাঃ শ্রাবণ, ১৩৬০; জুলাই ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
শ্রেণী সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আবুল কাসেম	২৭৫–২৯৪
সমীকরণ (গল্প)	মির্জা আ. মু. আবদুল হাই	২৯৫–২৯৬
কান্না (গল্প)	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	২৯৭–৩০২
ওয়েসিস (রম্য রচনা)	সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন	৩০৩–৩০৭
দু'টি বর্ষার কবিতা (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্	৩০৮–৩০৯
গান	আসকার ইবনে শাইখ	৩০৯

www.pathagar.com

আমার দেশ
·চট্টগ্রাম | মাহবুব-উল-আলম | ৩১০-৩১৪
মাটির সুর
রাখাল | আবদুল হাই সরকার | ৩১৪-৩১৬
সমালোচনা সাহিত্য
চারটি সাময়িকী সংবাদ | সেলিম চৌধুরী | ৩১৭-৩১৮
সম্পাদকের দৃষ্টিতে | | ৩১৯-৩২০

২য় বর্ষঃ ৭ম-৮ম সংখ্যাঃ ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬০; আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
এ যুগের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ		
(প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আজরফ	৩১৯-৩২৩
ওরা (গল্প)	শাহেদ আলী	৩২৪-৩৩২
আধুনিক বাংলা কবিতার		
সমস্যা (প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	৩৩৩-৩৪৫
আলমে বরজাখ (কবিতা)	মূলঃ আল্লামা ইকবাল	
	অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ	৩৪৬-৩৪৭
চলমান ইতিহাস (কবিতা)	আবদুর রশীদ খান	৩৪৮-৩৪৯
এখানে-এই পৃথিবীতে (কবিতা)	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	৩৫০-৩৫১
যথাসময় (গল্প)	আতোয়ার রহমান	৩৫২-৩৬২
আমার দেশ		
সিলেট জেলা	মোহাম্মদ রিয়াছত আলী	৩৬৩-৩৬৯
সংস্কৃতি সংবাদ		
নাট্যাভিনয়	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৩৭০-৩৭৩
নতুন বই		
নয়া দুনিয়া (সিরাজুল ইসলাম) ও		
গাড়োয়ান (এরশাদ হোসেন)		
-এর আলোচনা	আতোয়ার রহমান	৩৭৪-৩৭৬
শারদীয় সবুজপত্র (কলিকাতা)		
-এর আলোচনা	আহমদ ফারুক	৩৭৭-৩৭৮
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৩৭৯-৩৮০

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

মৃত্যুর শীতল হস্তস্পর্শে আমাদের ভেতর থেকে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ সাহিত্যরথীকে আমরা হারিয়েছি। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব এ জগতের দেনা-পাওনা চুকিয়ে রহস্য লোকের অভিসারী হয়েছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া

www.pathagar.com

ইন্না ইলাইহে রাযেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৪ বছর। এত দীর্ঘকালের জন্য তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। তবু মনে হয় এই অল্প সময়ের ভেতরে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাইনি যা তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে পেতাম। সাহিত্য বিশারদ সাহেব আমাদের ভেতরে এসেছিলেন একজন বর্তিকাবাহী হিসেবে। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠা বিংশ শতাব্দীর জনপদে এক ঐতিহাসিক প্রতিনিধি। তাঁর মাধ্যমে আমরা কবি আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতির শিল্পকলার রসাস্বাদ করতে সক্ষম হয়েছি। যথেষ্ট কায়িক শ্রম ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি আমাদের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধারের জন্যে যে সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ করেছেন তার পরিমাণ বড় কম নয়। এ ব্যাপারে তাঁকে যে সাধ্য-সাধনা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা চিন্তা করলে আমাদের আজ স্বভাবতঃই মনে হয় এ সমস্তর প্রতিদানে তাঁকে আমরা কতটুকু সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি? আর্থিক অবস্থা তাঁর খুব উন্নত ছিলো না। সামান্য কেরানীর চাকরী করে জীবন অতিবাহিত করেও কেউ সাহিত্যের উন্নতির জন্যে প্রাণপাত পর্যন্ত করেছেন, এ রকম উদাহরণ কেবলমাত্র সাহিত্যবিশারদ সাহেবের জীবনেই সীমাবদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেও আধুনিক কালের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিলো উদার, বিমুক্ত। মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগেও তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে সমস্ত লেখা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে আমরা একজন যোদ্ধা বলতে পারি। সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পারিপার্শ্বিকের সংগে সংগ্রাম চালিয়েছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও তিনি লিখেছিলেন। লিখতে লিখতে একসময় মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যবিশারদ সাহেবের মৃত্যুতে আমাদের সাহিত্যাকাশ থেকে ঝরে গেলো একটি নক্ষত্র যার শাশ্বত আলোকে আমরা ঐতিহাসিক পৃথিবীর সংগে স্থাপন করেছিলাম নিবিড় যোগসূত্র। জীবিত অবস্থায় প্রতিভার সম্মান আমরা কোনদিনই দেই না। এটা আমাদের স্বভাব ধর্ম। সাহিত্যবিশারদ সাহেবকে আমরা তাঁর সাধনার প্রতিদানে এমন কিছু দেইনি, যা দিলে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হতো। অবশ্য, এ সম্বন্ধে এখন কোনরূপ অনুশোচনা করা বৃথা। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যতের কথা। সাহিত্যবিশারদ সাহেবের আপ্রাণ সাধনার ফল তাঁর সংগৃহীত পুঁথিগুলো যাতে করে সংরক্ষিত করা যায় আজ সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বলাবাহুল্য এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীর দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের আকাঙ্খা এই যে মরহুম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পুঁথিগুলো যাতে সুসংরক্ষিত হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন। তাছাড়া সাহিত্যবিশারদ সাহেবের রচিত প্রবন্ধ যেসব ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে সেগুলোকে সংকলিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করলে, আমাদের মনে হয়, তাঁর প্রতি সর্বাপেক্ষা সম্মান দেখানো হতো। এ প্রস্তাবটা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে আবেদন জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

২য় বর্ষঃ ৯ম সংখ্যাঃ কার্তিক, ১৩৬০; নভেম্বর-ডিসম্বের, ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
আদর্শ ও আদর্শবাদী (প্রবন্ধ)	আহমদ ফরিদউদ্দিন	৩৮১-৩৮৬
ছাই-চাপা (গল্প)	আবদুর রহমান	৩৮৭-৩৯৪
সভ্যতা (প্রবন্ধ)	মোজাফ্ফর আহমদ	৩৯৫-৪০৩
ছাতাওয়ালা (গল্প)	লুৎফর রহমান	৪০৪-৪০৭
মাটিঃ আকাশ (কবিতা)	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	৪০৮-৪০৯
জাগৃতি (কবিতা)	জহুরুল হক	৪১০-৪১১
শিল্পীকে (কবিতা)	নাজমুল হক	৪১১-৪১২
নতুন বই		
জিবরাইলের ডানা (শাহেদ আলীর ছোটগল্পের বই-এর আলোচনা)	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৪১৩-৫১৬
কাদা মাটি	নাজমুল হক	৪১৬-৪১৭
(খোন্দকার নূরুল ইসলামের সম্পাদিত গল্প-সংকলন-এর আলোচনা)		
মাটির সুর	মীর আবুল হোসেন	৪১৯-৪২০
সংস্কৃতি-সংবাদ		
আজিমপুর এস্টেট চিত্র প্রদর্শনী	সেলিম চৌধুরী	৪২১-৪২৩
নোবেল প্রাইজ	নুরুল আলম	৪২৪
ইউজিন ও'নিল	আহমদ ফারুক	৪২৫
ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে (১৯৫২ সালের অক্টোবরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত) সাহিত্য শাখার উদ্বোধনী ভাষণ)	কবি শাহাদাৎ হোসেন	৪২৬

২য় বর্ষঃ ১০-১১শ সংখ্যাঃ পৌষ-মাঘ, ১৩৬০; জানুয়ারী-মার্চ-১৯৫৪

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন উমর	৪২৭-৪৩২
প্রশ্ন (গল্প)	জহাঙ্গীর খালেদ	৪৩৩-৪৪২
পুঁথি পড়া- মোহাররম মাসে (কবিতা)	ফররুখ আহমদ	৪৪৩-৪৪৪
অঘ্রাণের কবিতা (কবিতা)	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	৪৪৫-৪৪৭
সোনার হরিণ (কবিতা)	আল মাহমুদ	৪৪৮
ওয়েসিস (রম্য রচনা)	সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন	৪৪৯-৪৫২
কর্ডোভার আগে (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৪৫৩-৪৬৬

www.pathagar.com

নতুন বই

সঙ্গীত লহরী, গুলবাগ ও অশ্রুধারা (শেখ সাইফুল্লাহ্‌র কবিতার বই) –এর আলোচনা	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৪৬৫–৪৬৬
নকশা (তৈয়বউদ্দীনের বই –এর আলোচনা)	লুতফুল হায়দার চৌধুরী	৪৬৭–৪৬৮

সংস্কৃতি সংবাদ

শাহাদাৎ হোসেন (মৃত্যু)	আহমাদুর রহমান	৪৬৯–৪৭৫
মানবেন্দ্রনাথ রায় (মৃত্যু)	আহমদ ফারুক	৪৭১
পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ আসন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন	নূরুল আলম	৪৭১–৪৭২

২য় বর্ষঃ ১২শ সংখ্যাঃ ফাল্গুন– জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০–৬১; এপ্রিল–জুন, ১৯৫৪

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
চিরন্তন বিপ্লব (প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আজরফ	৪৭৩–৪৮৪
ওয়েসিস (রম্য রচনা)	সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসনে	৪৮৫–৪৯১
কর্ডোভার আগে (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৪৮৫–৪৯১
সাপিনী (গল্প)	–মোয়াজ্জম হোসেন	৫০৩–৫১৩
ইনকিলাব (কবিতা)	মূলঃ আল্লামা ইকবাল অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ	৫১৩–৫১৪

সংস্কৃতি সংবাদ

সাংস্কৃতিক নবজাগরণ, ইকবাল মৃত্যুবার্ষিকী, সাহিত্য সম্মেলন ও নজরুল দিবস	৫১৪–৫১৭

সম্পাদকের দৃষ্টিতে

আমাদের কৈফিয়ত (দ্যুতির বিলম্বিত প্রকাশের জন্য)	৫১৮

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যাঃ ভাদ্র, ১৩৬০; সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ট্রেনে (কবিতা)	ফররুখ আহমদ	১–৩
শরসন্ধান (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফর রহমান	৩–৫
চির বৈরাগী (কবিতা)	বদরুদ্দীন উমর	৬–৮

www.pathagar.com

দুটি কবিতা (কবিতা)	মূলঃ ডেভিড গ্রে, রবার্ট লুই স্টিভেনসন	৯
	অনুবাদঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্	
শান্তিনগরে সকাল (কবিতা)	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	১০
চিরন্তন বিপ্লব (প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আজরফ	১১–২৩
রূপান্তরের পথে (প্রবন্ধ) (অলডাস হাক্সলীর অনুরসণে)	আহমদ ফরিদ	২৪–৩২
কর্ডোভার আগে (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৩৩–৪২
বোবা কান্না (গল্প)	জাহাঙ্গীর খালেদ	৪৩–৫১
ভয় (গল্প)	মূলঃ পিয়েরী মিলে	
	অনুবাদঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক	৫২–৫৭

সমালোচনা সাহিত্য

'আর এক ঢাকায়'

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ সংখ্যা 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত দীপ্তেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'আর এক ঢাকায়' আমরা বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়েই পড়েছিলাম। বিগত 'প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনে' কলকাতা হতে এসে ঢাকাকে যে ঢাকা সম্পর্কে তাঁর ইতিপূর্বে ছিল "উৎকট ভীতি নয় অবাস্তব কল্পনার আতিশয্য, ভয়টাই বেশী"–তিনি দেখেছেন আর তারই চিত্র উপস্থাপিত করেছেন রচিত প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সম্পর্কে তাই আগ্রহ ও উৎসাহ দুইই ছিল। কিন্তু প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়ার পর এ সম্পর্কে কিছু লেখা আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করছি।

প্রবন্ধের দু'টি মূল্যবান অংশ আলোচনার শুরুতেই তুলে দিচ্ছিঃ "গোঁড়ামির প্রভাবে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ বিশ শতকেও এক আধা–সামন্ততান্ত্রিক সমাজ–ব্যবস্থায় আধা–সভ্য মানুষ।" "মনের মধ্যে উচ্চমন্যতা ছিল, ইংরাজীতে যাকে বলে সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। বেশ একটু অভিভাবকের ঢঙে দূরে বসে দেখার জন্যে সংস্কৃতি সম্মেলনে (সাহিত্য সম্মেলনে) গিয়েছিলাম।"

দীপ্তেন বাবুর 'চোখে' পূর্ব বাংলার মানুষ এখনো 'আধা–সভ্য।' কিন্তু তাঁর এই বিশেষ 'চোখ' ও তাঁর সাথে 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স'টির জন্ম নিশ্চয়ই পরিবেশগত কারণ থেকে, অর্থাৎ সভ্য দেশের মানুষ তিনি, কাজেই এখানকার মানুষদের আচার–আচরণ তাঁর কাছে আধা–সভ্যদের মত মনে হবেই। সাদা আদমী ইউরোপীয়রা যেমন কালা আদমীদের দেশ আফ্রিকাতে যেত তাদের সভ্য করবার মহান মিশন নিয়ে–দীপ্তেন বাবুর আগমনও কী তেমন মিশন নিয়েই হয়েছিল নাকি, অন্ততঃ লেখাটি পড়ে যদি তাঁর তেমন মানসিকতার নিদর্শন কেউ খুঁজে পান তাহলে তার জবাবে তাঁর বক্তব্যটা কী হবে–আমরা জানতে উৎসুক রইলাম।

সমস্ত দেশের জনগোষ্ঠি সম্পর্কে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির প্রতিবাদ আমরা জোর গলাতেই করতাম, কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যাদের আচরণ সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন

www.pathagar.com

মানুষের হাসির উদ্রেক করে এবং তাদের প্রগলভ উক্তির প্রতিবাদ করতে গেলেও তাদের প্রতি অযথা গুরুত্বই দেওয়া হয়। এ ছাড়াও তাঁর অনেক হাস্যকর উক্তি প্রবন্ধটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে, সে সমস্ত উক্তির প্রতিবাদও তাই আমরা করবো না—শুধু পাঠক সাধারণের কাছে তাদের উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত হব।

ঢাকারই এক রিকসাওয়ালা দীপ্তেন বাবুকে বলছে–"আপনে শহীদগো 'পুষ্প' দিবার গেছিলেন...."

'পুষ্প' শব্দটি একজন রিক্সাওয়ালার মুখে শুনলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় বইকি, কিন্তু রিক্সাওয়ালাটি সাধারণ রিক্সাওয়ালা নয়– সে "এটু এটু পদ্য লেখার চেষ্টা চরিত্র" করে। রিক্সাওয়ালাদের জীবনের সীমাহীন অজ্ঞতা, দুঃসহ অর্থনৈতিক নিপীড়নের খবর যারা রাখেন তাদের কাছে একজন রিক্সাওয়ালার পক্ষে কবিতা লেখাটা সাধারণ ঘটনা মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। ধরে নিচ্ছি সে একজন অসাধারণ রিক্সাওয়ালা। কিন্তু তার মুখে আরো শুনুনঃ

"আপনাগো মধ্যে একজন পদ্য লেখক আছেন না কর্তা, কংগ্রেস যেনারে ধরবার চায়? যিনি নাকি লালঝান্ডা হইসেন।" অর্থাৎ দীপ্তেন বাবু আমাদের বিশ্বাস করতে বলছেন যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা মেহনতী মজুরদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে। এই সাথে ভেবে দেখুন ব্যাপারটাঃ

সুভাষ বাবু কলকাতার কবি, যার লেখা পড়বার সুযোগ ঢাকায় স্বভাবতঃই অত্যন্ত সংকীর্ণ। সেই ঢাকার একজন রিক্সাওয়ালা যে নাকি নাম পর্যন্ত বলতে পারল না সুভাস বাবুর (তার বদলে বলল 'একজন') সে ইতি–উতি সব খবর রাখছে তাঁর। তার চেয়েও অবাক কথা তিনি যে 'লালঝান্ডা' আর তিন–রঙা ঝান্ডার মানুষেরা যে তাঁকে ধরতে চান সে খবরও জানা আছে রিক্সাওয়ালার। কী সুগভীর তার রাজনৈতিক সজ্ঞানতা যে ঢাকার বস্তিতে থেকে বুঝতে পারছে 'একজন' আছেন যিনি কবিতা লেখেন, যিনি লালঝান্ডা, যিনি গ্রেপ্তার হবেন।

'আধা–সভ্যদের' দেশের বস্তির অধিবাসী রিক্সাওয়ালার পক্ষে এ ধরনের রাজনৈতিক সজ্ঞানতা থাকাটা অস্বাভাবিকই বটে। প্রবন্ধের প্রথম পাতাতেই এক জায়গায় রয়েছে– "এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর বিছানা গুটিয়ে (স্টিমারের ডেকের ওপর) একটি থুত্থুড়ে 'মোল্লাকে' 'ওজু' করার জন্য বিছানা গুটিয়ে জায়গা করে দেওয়া–ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকবারই কথা আপনাদের। কিন্তু আসলে ও শব্দটি হবে 'নামাজ'। তাহলে ভেবে দেখুন সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সসম্পন্ন প্রবন্ধকারের পান্ডিত্য কত সুগভীর। কিন্তু সুগভীর পান্ডিত্যের ছাপ আরও আছে।

সেই কবিতা–লেখা রিক্সাওয়ালার স্ত্রীর সাথে দীপ্তেন বাবুর কী সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন জানেন?–'ফুফা'। অর্থাৎ মহিলা হয়েছেন দীপ্তেন বাবুর ফুফা। দীপ্তেন বাবু নিজেই আবার বুঝিয়ে দিয়েছেন 'ফুফা' শব্দটির অর্থ কী–অর্থটা নাকি 'পিসি'। ভাবছি, এই পন্ডিতি আবিষ্কারটি রিক্সাওয়ালাও সংশোধন করে দেয়নি বা দিতে পারেনি। 'আর এক ঢাকার' অপর একটি মূল্যবান অংশ হচ্ছে এইঃ "ধুতি যে দু'একজন পরেন তাঁরা

www.pathagar.com

প্রায়ই মুসলমান। আর সবাই পরেন লুঙ্গি এবং পায়জামা কিংবা প্যান্ট। তাতে কি? পায়জামা প্যান্ট তো আমরাও পরি এখানে। আর লুঙ্গি? সে বস্তুটাও দেশে অপেক্ষাকৃত সস্তা, তাই"।

আর এক জায়গায়–"আজ এখানে (পূর্ববঙ্গে) নতুন করে মানুষ ধুতি পরতে আরম্ভ করেছে। জাতীয় পোষাক, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, মাতৃভাষা.. এর সম্মান রক্ষা না করা কী মানুষের কাজ?"

বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াচ্ছে এইঃ পূর্ববঙ্গের মানুষরা এ পর্যন্ত 'আধা–সভ্য' ছিল, এখন তারা 'জাতীয় পোষাক' ধুতি পরে মানুষ হতে চলেছে। অবশ্য এখনো অনেকে লুঙ্গি পরে কারণ পুরো মানুষ হতে তো এখনো দেরী আছে। আর লুঙ্গি পরার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ–বর্তমান লুঙ্গির দাম কম। লুঙ্গি তৈরী করতে যে অল্প খরচ পড়ে তা দীপ্তেন বাবুর দেশের লোকদেরও তো অজানা থাকবার কথা নয়। তাহলে, আমরা কী ধরে নেব যে, ভারতের মানুষ এখন দলে দলে মানুষের পোষাক 'ধূতি' ছেড়ে আধা–সভ্যদের লেবাস লুঙ্গি পরা শুরু করেছে!

প্রথম উদ্ধৃতিটার 'তাতে কি' শব্দ দু'টোর অবস্থিতির কারণটা আমরা অনুধাবন করতে পারলাম না। কলকাতার পাঠকদের কাছে এখানকার মানুষদের লুঙ্গি পরার জন্যে কী দীপ্তেন বাবুকে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে নাকি? ধূতি পরে এখানকার অধিবাসীরা মানুষ হচ্ছে–ভালো কথা, তা তাদের হতেই হবে কারণ সুসভ্য দেশে মানুষরা যে ওই পরে, আর 'মহাজ্ঞানী মহাজন' তো রয়েছেই; কাজেই দীপ্তেন বাবুর মত মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরো দু'চারজন 'আধা–সভ্য' হয়তো ধূতি পরে 'সভ্য' হওয়ার সুযোগ পাবে–এদিক দিয়ে বলতে গেলে অন্ধদের এই দেশে তিনি অন্ততঃ কয়েকজনকে হলেও দৃষ্টিদান করে গেলেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

এখানে লুঙ্গির দাম কম বুঝলাম, কিন্তু আশ্চর্যের কথা পরেই আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "ঢাকা শহরে একটা লুঙ্গির দাম আট টাকার বেশী।" আর, লুঙ্গির দাম "অপেক্ষাকৃত সস্তা"। তাহলে পায়জামার দাম কী এখানে বিশের কোঠায় উঠেছে নাকি? এও তো আমাদের জানা ছিল না।

এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "মার্কিনী চক্রান্তে হলিউডের ফিলম জার্নালে দেশ (আমাদের) ছেয়ে গেছে।" আবার–"অথচ নেই হলিউড বা টলিউডের নাচা–নাচি"! এর এক লাইন পরে–"রাজনীতির চক্রান্তে মার্কিনী ফিলমের আনাগোনাই বেশী"। আছে অথচ নেই–ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন।

বলেছিলাম, প্রতিবাদ করবো না, কিন্তু ঢাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম দিকেই লেখক যা বলেছেন, তার প্রতিবাদ আমাকে করতেই হচ্ছে। আমার নেহাৎ দুর্ভাগ্য সেখানে তিনি টেনে এনেছেন আমাকে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দীপ্তেন বাবু বলছেনঃ "মনে পড়ছে ওয়াসেকপুরীর কথা। ঢাকা শহরে কোন একটি পত্রিকা অফিসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম আমরা। ওয়াসেকপুরী তরুণ কবি এবং সেই পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক। কথায় কথায় জল এল কবির চোখে। তিনি

www.pathagar.com

বললেনঃ আসুন, আমরা কাঁদি! আপনার এবং আমার পূর্বপুরুষ এতদিন যে পাপ করেছেন, আসুন আমরা কেঁদে তার প্রায়শ্চিত্ত করি। তবে যদি আবার দুই দেশের প্রাণ এক হয়ে মিলতে পারে। তারপর একটু থেমে বললেনঃ কিন্তু কেঁদেই বা কি হবে? কাজ চাই। আপনি কলকাতায় গিয়ে বলবেন দীপ্তেন বাবু, কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি।"

দীপ্তেন বাবু 'কাফেলা অফিসে' স্বশরীরে এসেছিলেন। সেখানে তার সাথে আলাপও হয়েছিল।

গত সাত বছর ধরে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমি যে সব লেখা লিখেছি, তাতে এই কথাটাই স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছি যে বিভাগের পরে আমরা গঙ্গা, ভাগীরথী ছেড়ে পদ্মা, মেঘনার দেশকে নিয়ে আছি, সেই দেশই আমাদের অন্তরের অন্তরতম লীলাভূমি, তারি রস-নিষিক্ত মর্মাসনই আমাদের একমাত্র বিহারকেন্দ্র, মিলন ক্ষেত্র, চারণ ভূমি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-সব কিছুর পবিত্র উৎস-মূল।

-এই কথাটাই 'কাফেলা অফিসে' বসে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলাম দীপ্তেন বাবুকে এক ঘন্টার সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

"ঢাকার প্রাণের ঢাকনি" দীপ্তেন বাবুর কাছে খুলে গেছে--সে ভাল কথা। কিন্তু যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, যে সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতার সাথে তিনি গোটা পূর্ববঙ্গকে দেখে গেলেন তা নিঃসন্দেহে মৌলিক। দু'চারদিনের জন্যে কোন বিদেশ ঘুরে এসে মাসিক পত্রে সে দেশ সম্পর্কে লম্বা প্রবন্ধ ফাঁদতে আমরা দেখেছি, কিন্তু সে প্রবন্ধে যে এমন হাস্যকর বস্তু থাকতে পরে তা আমাদের ধারণা ছিল না। দীপ্তেন বাবু সে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমাদের দিলেন, এ জন্যে উপসংহারে আবার তাঁকে ধন্যবাদজানাচ্ছি।

-আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী

সংস্কৃতি সংবাদ

অশ্লীল পত্র-পত্রিকা

আজাদী লাভের পর প্রায় সাত বৎসর গড়িয়ে চলল। কিন্তু স্বাধীন দেশের নাগরিকদের চেতনা ও মননশীলতার বিকাশের একটি সুষ্ঠু পরিবেশ এখনও আমাদের দেশে গড়ে উঠতে পারেনি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের জন্য শুধু রাজনৈতিক গোলামী ও অর্থনৈতিক দারিদ্র্যই বয়ে আনেনি, আমাদের সংস্কৃতিকেও তারা বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চেতনার পরিচ্ছন্ন বিকাশের। কিন্তু আজ আমাদের দেশে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করবার পথে বহু দেশী-বিদেশী অশ্লীল পত্র-পত্রিকা মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করে আসছে। পাক-বাংলার রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরের বুকস্টল (book stall) গুলিতে ছায়া-ছবি ও যৌন পত্রিকার প্রাচুর্য্য দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিদেশী

www.pathagar.com

পত্রিকার–ন্যুড ও ট্রু–রোমান্স প্রভৃতি নামে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের রুচি বিহীন যৌন আবেদনমূলক উলঙ্গ চিত্র সম্বলিত পত্র–পত্রিকার বহুল আমদানী ও অবাধ বিতরণের ফলে আমাদের দেশের অগণিত অপরিণত বয়স্ক ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের বিপথগামী হওয়ার আশংকা আজ বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। ইহাই সব চাইতে মারাত্মক সমস্যা। উপরন্তু বছরের পর বছর এই জাতীয় পত্র–পত্রিকা বিদেশ হতে আনার ফলে দেশের কষ্টলভ্য হাজার হাজার বিদেশী মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। এই ধরনের পত্র–পত্রিকা যে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশে গড়ে তোলার পথে ভয়ানক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে–ইহা অত্যন্ত মর্মন্তুদ। এই জাতীয় পত্র–পত্রিকা আমদানী ও বিতরণের ব্যাপারে লাইসেন্স অনুমোদন করার সময় সরকারীভাবে ইহার উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা আশু প্রয়োজন। আমরা এদিকে আমাদের সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি সরকার অনতিবিলম্বে এই জাতীয় পত্র–পত্রিকা বিদেশ হতে আমদানী করার লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে আয়াসলব্ধ বিদেশী মুদ্রার অপচয় বন্ধ করে দেবেন। ফলে আমাদের দেশে আকাঙ্খিত সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারবে। পশ্চিম পাকিস্তান হতেও এ ধরনের দু'একটি নগ্ন পত্রিকা ইংরেজী ও উরদু ভাষায় ছায়া–চিত্রতারকাগণের নগ্ন ছবি সম্বলিত হয়ে পূর্ব–পাকিস্তানে আসছে। পূর্ব–পাকিস্তানেও চিত্রতারকাগণের নগ্ন ছবি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন প্রচারপত্রে ও প্রাচীরে স্থান লাভ করছে। এই ধরনের প্রচার যে অজ্ঞাতসারে জাতির নৈতিক চরিত্রহীনতা ঘটানোর ব্যাপারে ব্যাপকভাবে ক্রমাগত সাহায্য করছে–ইহা অনস্বীকার্য। এ জাতীয় পত্র–পত্রিকাগুলির মালিকগণ তাদের রুচিবিহীন প্রচার কার্যের মারফতে নিজ নিজ আয়ের পথ প্রশস্ত করছেন, কিন্তু এর বিনিময়ে মানুষের সুপ্ত যৌন চেতনাকে জাগ্রত করার ব্যাপারে এরা যে ভূমিকা গ্রহণ করছেন তাও রীতিমত শঙ্কাপ্রদ। পত্র–পত্রিকা ব্যতীত ছায়াচিত্র সম্বন্ধেও আমাদের জোর আপত্তি রয়েছে। বিকৃত রুচীর ছায়াচিত্র আমাদের ভবিষ্যত নাগরিকগণের কোমল মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সাংস্কৃতিক জীবনে তাদেরকে পরের অনুকরণপ্রিয় করে তুলবার মত মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় ছায়াচিত্র আমদানীর ব্যাপারে সরকারকে আরও জোরালো গোছের বাধা নিষেধ আরোপ করার জন্য করদাতাদের দাবী বিবেচনা করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

আমরা আরও মনে করছি যে, পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অনতিবিলম্বে অশ্লীল পত্র–পত্রিকা ও ছায়াচিত্র বিদেশ হতে আমদানী ও দেশের মাটিতে তাদের জন্মের প্রতি কড়া বাধা নিষেধ আরোপ করা সরকারের কর্তব্য। তা না হলে জাতীয় জীবনে এর যে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ও মারাত্মক কুফল দেখা দেবে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

–সৈয়দ মুস্তফা জামাল

www.pathagar.com

ঘোড় দৌড়ের পুনঃপ্রবর্তন

বিষয়টি ঠিক সংস্কৃতি সংবাদের পর্যায়ে না পড়লেও ঘোড় দৌড় প্রবর্তনের সাম্প্রতিক সংবাদটি নিঃসন্দেহে সংস্কৃতি সচেতন মানুষ মাত্রকেই সচকিত করেছে বলে সে সম্পর্কে আলোচনা সংস্কৃতি সংবাদের পর্যায়ে ফেলা চলে। বস্তুতঃ এ সংবাদে সচকিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা এতে করে সংস্কৃতির উপর আরো একটি অশুভ আক্রমণ উদ্যত হওয়ার আশঙ্কা করা যাচ্ছে। শুধু আশঙ্কা নয়, ঘোড় দৌড়ের প্রবর্তনের সাথে সাথেই তা সত্যে পরিণত হবে। অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, নোংরা ছায়াছবি যেভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তেমনি আরো একটি ক্ষত ঘোড় দৌড় যে সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহ করবার অবকাশ কোথায়?

দেশের এক বিরাট অংশের দৃষ্টি খেলাটি প্রবর্তিত হওয়ার সাথে সাথেই সেদিকে আকৃষ্ট হবে-তার ফল দাঁড়াবে মারাত্মক। ' 'স্পোর্টস' বলে যাকে অভিহিত করা হচ্ছে সমস্ত দেশের পক্ষে তা প্রমাণিত হবে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর বলে। কতিপয় প্রতিষ্ঠান 'ইকনমিক এইড', 'শব্দ পূরণ' ও 'শব্দ সন্ধান' প্রতিযোগিতা প্রভৃতির নামে যে খেলা খেলে জাতীয় জীবনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তুলেছিল এবং এখনো ক্রমান্বয়ে তুলেই চলেছে, তারি সাথে ঘোড়দৌড় নতুন স্রোতের সৃষ্টি করে আবহাওয়াকে আরো বিষাক্ত করে ফেলবে। ফলে যে ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর পবিবেশের সৃষ্টি হবে তাতে করে আমাদের সাংসকৃতিক জীবন আরো গভীরভাবে পর্যুদস্ত হতে বাধ্যহবে।

সে জন্যে দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোড়দৌড় খেলা পুনঃপ্রবর্তন না করার জন্যে দাবী জানাচ্ছি।

—খোরশেদ আলম

নতুন বই

কুলসুম

গল্পের বই।। আব্দুল হাই মাশরেকী ।। শাহজাহান লাইব্রেরী, বাবু বাজার, ঢাকা ।। দাম ঃ এক টাকা আট আনা।

পূর্ববাংলায় কথাশিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা চলছে। এদিকে কয়েকজন লেখকের বিশেষ লক্ষ্য দেখা গেছে। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার কৃষ্টি, জীবন অবলম্বনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে যে কয়েকজন সাহিত্যিক সাহিত্য আসরে এগিয়ে এসেছিলেন কবি আব্দুল হাই মাশরেকী এঁদেরই একজন। কবি বেশ কিছুদিন আগে থেকেই লিখছেন। সম্প্রতি তাঁর ছোট গল্পগ্রন্থ 'কুলসুম' প্রকাশিত হলো। মাশরেকী সাহেবের কবিতা ইতিমধ্যে বাংলার সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পূর্ববাংলার গ্রাম্য জীবনের কথার সুর ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়, সেখানে গ্রামের রাখাল, কৃষাণ কৃষাণী কথা বলে ওঠে সহজ সুরে অকৃত্রিম কণ্ঠে। কুলসুমের কাহিনী চতুষ্টয় অনুরূপ গ্রাম জীবনের

www.pathagar.com

বিভিন্ন দিকের রূপায়ণ।

লেখকের প্রথম গল্প 'বাঁশি' আঙ্গিকে অসাধারণত্ব দাবী করতে পারে না। এখানে কবির সংবেদনশীলতার জন্য চরিত্র স্পষ্ট। কিন্তু গল্পের অন্যান্য দিক দুর্বল। 'নীল পাহাড়' লেখকের সার্থক সৃষ্টি, কাহিনী বিন্যাস প্রশংসাই, তবু কাহিনীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে লেখক একটু বেশী কথা বলেছেন। নীল পাহাড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে নায়কের রোমান্টিক মন অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে পাঠকের মন আকর্ষণ করে। 'কন্যা' লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। বিয়ের কথার শুরুতে নায়িকাচিত্তের আলোড়ন স্বাভাবিকভাবেই গল্পে বলা হয়েছে মাতৃস্নেহ কন্যার বিয়ের পর যে সুখ-স্বপ্ন রচনা করে সেখানে হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। অপরদিকে আজন্ম স্নেহে যত্নে লালিত কন্যার বিচ্ছেদব্যথা মাতৃমনকে ব্যাথায় নিঃসাড় করে ফেলে। এই চিরন্তন বেদনাবোধের শৈল্পিক রূপায়ণ. লেখকের শক্তি সম্বন্ধে, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠকের মনকে সচেতন করে। 'কুলসুম' গল্পে লেখক সমাজের দুই শ্রেণীর স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করে তুলেছেন। কঠোর পরিশ্রমের পর যে মানুষ গৃহ-সুখের আশ্রয় প্রেম পরায়ণা স্ত্রীর সাহায্যে ক্ষণিকের জন্যও দুর্লভ সম্পদ খুঁজে পায়, সেখানে প্রভূর নির্মম হস্ত সে সুখে বাধা দেয়। আজকের যুগে মানুষের হৃদয়ের এত বড় ভয়াবহ দুর্দশা লেখক আশ্চর্য সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মাশরেকী কবি, পল্লীর অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় স্পষ্ট। মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপরিসীম। কিন্তু তবু উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকের যে স্বাধীনতা রয়েছে, গল্পের ক্ষেত্রে তার স্থান নেই। মাশরেকী সাহেবের গল্পে এই লক্ষণ দেখেছি। এদিকে সতর্ক হলে তার অভিজ্ঞতা প্রসূত কাহিনী অধিকতর সমাদর লাভ করবে সন্দেহ নেই। 'কুলসুম' সুধী সমাজে সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—জহুরুল আলম

দুরন্ত ঢেউ

নাটিকা সঙ্কলন ।। আসকার ইবনে শাইখ ।। প্রাপ্তিস্থান ঃ তমদ্দুন লাইব্রেরী, ১৯, আজিমপুর ঢাকা । পাঁচ সিকা।

সাহিত্যের অন্য যে কোন শাখার চেয়ে সমকালীন মন ও মানসের প্রতিফলন নাটকের ওপর পড়ার অবকাশ বেশী-এ কথা স্বীকার করতেই হবে। নাট্যকারের ওপর পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর প্রভাবে তা পড়ছেই, তার চেয়েও বড় কথা সচেতন ভাবেও নাট্যকার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন সমকালীন মানুষের চিন্তাধারার দ্বারা। কেননা সমসাময়িক দর্শকদের তৃপ্তি দেওয়ার জন্যেই তাঁর রচনা, সমকালীন শিল্পীরাই তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রী, আর সে নাটক মঞ্চস্থ করার পেছনে যারা থাকছেন তারাও সমকালীন সমাজেরই মানুষ। আসকার ইবনে শাইখের নাটিকা সঙ্কলন 'দুরন্ত ঢেউ' সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলো এই যে সমকালীন মানসের প্রভাব সঙ্কলিত নাটিকা চারটির মধ্যেইবর্তমান।

www.pathagar.com

যে নাটিকার নামানুসারে বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে সে নাটক–'দুরন্ত ঢেউ'–'দ্যুতি'তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে কারনে 'দ্যুতি'র পাঠকদের সাথে তার পরিচয় থাকার কথা। মোটামুটিভাবে একে সঙ্কলিত নাটিকাগুলোর মূল সুরের প্রতিনিধিত্ববাহী বলা চলে। আর একটি মাত্র লাইনে যদি উপরোক্ত নাটিকাটির সমগ্র বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে হয় তাহলে সে লাইনটি হবে এইঃ

"ভয় নেই, ঢেউয়ের আঘাতে ধসে পড়ছে শক্ত উঁচু পাড়, ভেঙ্গে পড়বে অন্যায়ের পাষাণ পাঁজা, দুরন্ত ঢেউ আজ সবখানে।"

'দুরন্ত ঢেউ' ছাড়া 'দুর্যোগ', 'যাত্রী' ও 'আওয়াজ' নামক আরো তিনটি একাঙ্কিকা বইতে স্থান পেয়েছে।

নাটকের অপরিহার্য যে সংঘাত প্রথম তিনটি নাটিকাতে রয়েছে, তা বলা চলে মূলত প্রায় এক। সংসারের বন্ধন ও আদর্শের আহবান–সংঘাতটা মূলতঃ এই দু'য়ের ভেতরেই। 'দুর্যোগে' কর্মী আমজাদকে টানছে 'রাজকন্যা' রিজিয়া, 'যাত্রী' এসরার সেলে বসে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে "দুঃখভরা সংসারের নানা ছবি", আর 'দুরন্ত ঢেউয়ে' আজহার প্রশ্ন করছে সায়েরাকে "তুমি আসবে সায়েরা আমাদের পথে?"–সায়েরা আসতে পারছে না, বরং আজহারের জন্যে যেন বন্ধনই সৃষ্টি করছে। 'আওয়াজে' বিরোধ বেঁধেছে ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে।

নাট্যকার আশাবাদী। তাই দেখি দুর্যোগের মাঝেই এগিয়ে যাচ্ছে আমজাদ। এসরার শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করছে–"দুর্নিবার যাত্রীদল–আমিও এদেরই একজন"। সায়েরা নিজেই চলে যাচ্ছে আজহারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে; আর সামাজিক অন্যায়ের প্রতীক "মওজুতদার আলিম চকদার" শেষ পর্যন্ত নিজ হাতে চাবি বের করে দিচ্ছে মওজুত ধানের গোলার 'ভাঙ্গন' দেখতে।

সমসাময়িক মন ও মানসের ছাপ বহন করলেও একথা সত্য যে, উপস্থাপিত সংঘাতগুলো নিঃসন্দেহে চিরন্তন বলে মর্যাদার দাবী করতে পারে। এ কারণে সমকালীন চিন্তাধারার প্রতিফলন বহন করলেও নাটিকাগুলোকে নেহায়েৎ 'সাময়িক'–অর্থাৎ বর্তমানেই শুধু যার মূল্য থাকবে–এমন বলা চলে না। সামাজিক সংঘাতের প্রতিভূ হিসেবেই যে শুধু চরিত্রগুলোর মূল্য তা নয়–'চরিত্র' হিসেবেও তাদের মূল্য নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

'দুর্যোগ ', 'যাত্রী' ও 'দুরন্ত ঢেউয়ের' নায়ক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। আর তাদেরকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত বেঁধে উঠেছে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থেকেই তার উৎপত্তি। 'দুর্যোগে'র আমজাদের বিয়ে হওয়ার কথা ধনীর একমাত্র কন্যা রিজিয়ার সাথে, পরীক্ষা দেওয়ার কথা সি,এস,পি। 'যাত্রী' এসরার বন্ড লিখে দিয়ে অনায়াসে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তারো ছিল 'সুখের সংসার', দিন ছিল 'আনন্দ আহ্লাদের', এখনো সে 'সামলাতে পারে' নিজের 'ঘর'। আর 'দুরন্ত ঢেউয়ে'র আজহার স্বীকার করে নিতে পারতো সায়েরার বন্ধনকে–তবু তারা কেউ তা করল না, পা

www.pathagar.com

বাড়াল দুর্যোগের তরঙ্গ-সঙ্কুল পথে।

আমাদের সাহিত্যে নাটকের অভাব সুবিদিত। সে অভাব পুরণে আসকার ইবনে শাইখের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর একাঙ্কিকা নাটিকার সঙ্কলন এ পর্যন্ত প্রায় প্রকাশিত হয়ইনি বলে, 'দুরন্ত ঢেউ'কে একটি স্থায়ী অভাব মেটানোর জন্যে বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা চলে।

নাটক রচনা যদি কঠিন হয় তাহলে একাঙ্কিকা নাটিকা রচনা নিঃসন্দেহে কঠিনতর। সামান্য আয়তনের ভেতর চরিত্র রচনার সমস্যা ত আছেই; ঘটনা উপস্থাপন, তার প্রবাহ, উৎকর্ষ Climax ও নিম্নগমনের মধ্য দিয়ে পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া এবং সেই সাথে সংঘাতের সৃষ্টি করাও কম দুরুহ নয়। তার জন্যে প্রয়োজন পরিমিতিবোধ ও সচেতন শিল্প-জ্ঞানের। সে প্রয়োজন কমবেশী 'দুরন্ত ঢেউ'তে মিটেছে-এ কথা বলা চলে। তবু অতিরিক্ত সীমিত বলে 'যাত্রী'কে অন্য তিনটি নাটিকার পাশে ম্লান মনে হয়। নাটকীয়তার অভাব হয়ত তাতে নেই কিন্তু এসরারের মনের দু'টো ভাবনার তীব্র বিরোধটাকে যে উপায়ে দর্শক সাধারণের কাছে পরিবেশন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে তাকে খুব বেশী শিল্প-কৌশল-সমৃদ্ধ বলা চলে না। মাত্র ছয় পৃষ্ঠার আয়তনে নাটিকাটি তাই পূর্ণভাবে আবেদনশীল হওয়ার অবকাশ পায়নি। এছাড়া 'দুরন্ত ঢেউ'য়ের পরিণতির সময়ে হঠাৎ গান শোনা যাওয়া এবং 'দুর্যোগে' 'পাশের কোঠা থেকে রেডিওতে গান' বেজে উঠাটা মঞ্চের চেয়ে সিনেমা টেকনিকের কথাই বেশী করে মনে করিয়ে দেয়। পরিবেশের বর্ণনাতে নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

একাঙ্কিকা নাটক রচনার ক্ষেত্রে লেখকের এ প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

-সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পূর্ববাংলার কবিতা

কবিতা সংকলন ।। সম্পাদনায় ঃ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল ।। তমদ্দুন লাইব্রেরী, ১১, আজিমপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ।। দাম ঃ দেড় টাকা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত সাত বছর আমাদের সাহিত্যের গঠনমুখীতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পূর্ববাংলার সাহিত্য কোন্ রূপ নেবে এ নিযে তর্ক বিতর্কও কম হয়নি। গত সাত বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা একটু উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এখানকার সাহিত্যে মত ও পথ নির্ধারণের চেষ্টা যতটুকু হয়েছে সে তুলনায় গঠনমূলক সাহিত্য খুব কমই সৃষ্ট হয়েছে। পাকিস্তানোত্তর যুগে সুষ্ঠু সাহিত্যালোচনা পরিণত হয়েছে অবাঞ্ছিত কলহ- কোন্দলে। ফলে সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটার পরিবর্তে নেমে এসেছে সংশয়ের ছায়া। এ সংশয় তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে আমাদের কবিদের মনে, বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যে যারা সবে মাত্র আত্মপ্রকাশ

www.pathagar.com

করেছেন তাঁদের। এ ধরনের হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশে পূর্ববাংলার বত্রিশজন আধুনিক কবির কবিতা সংকলন 'পূর্ববাংলার কবিতা'র আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

আলোচ্য সংকলনে স্থান পেয়েছে ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, মতিউল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল হাই মাশরেকী, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, চৌধুরী ওসমান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দীন-আল-আজাদ, মুযহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মামুন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, জাহানআরা আরজু, রওশন ইজদানী, সৈয়দ আলী আশরাফ, নুরুন্ নাহার, শাহেদা খানম, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, তরীকুল আলম, চৌধুরী লুৎফর রহমান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবদুর গাফফার চৌধুরী, মফিজ উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ও আবু হেনা মোস্তফা কামালের কবিতা।

ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম চেতনা ও স্বাজাত্যবোধের ক্রমঃবিকাশের ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বিভাগোত্তর যুগের পূর্ববাংলার সাহিত্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "বিভাগ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানীদের আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য বিপর্যয়ের সাথে সাথে সাহিত্য জগতে যে একটা বিশেষ সমস্যা মাথাচাড়া দেয় তা হলো-পূর্ববাংলার সাহিত্য কোন রূপ নেবে? পূর্ববাংলার সাহিত্য কী গঙ্গা-ভাগিরথী তীরে সমৃদ্ধ সাহিত্যকেই তার ঐতিহ্য হিসাবে গণ্য করবে, না যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যবোধের তাগিদে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে ভিত্তি করে নতুন সাহিত্য গড়ে তুলবে।" এই সমস্যার সমাধানের পথ হিসেবে ভূমিকায় বলা হয়েছে, "দেশের আপামর সাধারণের জীবন নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয়নি তা কোন কালেই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত, কাজেই এখানকার সাহিত্যও হবে ইসলামের মুল্যবোধ ভিত্তিক... সাহিত্যের এই ভাবধারা পূর্ববাংলার কাব্য সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।"

সম্পাদকদ্বয়ের এই মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের সংকলনের অধিকাংশ কবিতাতেই- যেমন ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুর রশীদ খান, সৈয়দ আলী আশরাফ ও আরো অনেকের কবিতায়।

ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, "আদর্শের কথা ছাড়াও পূর্ববাংলার সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি হবে কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র্য, কারণ, কলিকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যের ভাষা, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি এখানকার মানুষের চিন্তাধারা ও জীবন পদ্ধতির সঙ্গে মূলীভূত নয়। ... এ সংকলনে যে সব কবিতা স্থান পেয়েছে তাতে সামগ্রিকভাবে পূর্ববাংলার নিজস্ব সুরের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করি। সংগৃহীত

www.pathagar.com

কবিতাগুলোতে আছে দেশজ অনুভূতির রূপায়ণ, ইসলামী আদর্শের কাব্যরূপে ব্যক্তিমানসের অভিব্যক্তি।" সম্পাদকদ্বয়ের এ মন্তব্যের যথার্থ পরিচয় প্রায় সবগুলো কবিতাতে থাকা সত্ত্বেও এ কথা না বলে উপায় নেই যে, সংকলনের কয়েকটি কবিতায় পশ্চিম বাংলার কবিদের অনুকরনের ছাপ সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ শামসুর রহমানের 'তার শয্যার পাশে' উল্লেখ করা যায়। এতে পশ্চিম বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের প্রভাব সুগভীর।

পরিশেষে আমরা তরুণ সম্পাদকদ্বয়কে এ জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, এ ধরনের একটি সামগ্রিক ও সুষ্ঠু কবিতা সংকলন করে তাঁরা পূর্ববাংলার সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। বইটির ছাপা বাঁধাই প্রশংসনীয়।

—বদরুল মুনির

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে

আসকার ইবনে শাইখ